# অভিমন্যু

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ রাখী পূর্ণিমা ১৩৬৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
দি তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১/১ দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীদেবকুমার বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

## ॥ এক ॥

দেখতে দেখতে ষোল বছরে পা দিল অভিমন্যু। শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে সে এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। সকলের কাছে সে শুনেছে, পাণ্ডবদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে সেই কবে তাকে আর অন্যান্য পুরমহিলাদের নিয়ে মা সুভদ্রা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মাতুলালয় দ্বারকাপুরীতে চলে এসেছে! তখন সে একবারে ছেলেমানুষ, সবে মাত্র তিন বছরের শিশু! তারপর এক এক করে কত দিন, কত মাস, কত বছর অতিবাহিত হয়ে গেল! সেদিনের সমস্ত কথা মনে নেই তার! মনে রাখার মত বুদ্ধি আর বয়েস তখনও তার হয় নি। সব যেন অস্পষ্ট, কেমন ভাসাভাসা, অনেকটা দূরান্তরিত সুখস্বপ্নের মত! তবু সেদিনের কথা ভাবতে ভীষণ ভাল লাগে তার! কেন ভাল লাগে, তা সে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। এই ভাললাগা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবু কেমন একটা আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করে সে। কি এক আশ্চর্য সুন্দর মোহময় আবেষ্টনী দিয়ে ঘেরা তার অতি শৈশবের সেই দিনগুলি! সেদিনের আবছা আবছা টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও তার সমস্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করে কি এক অচিন্ত্যপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অভিমন্যু আর আগের মত জাগতিক জ্ঞানবুদ্ধিহীন ছোট্ট ছেলেটি নয়। সে এখন ষোল বছরের পূর্ণ যুবক। ভাল-মন্দ সব কিছু অনুভব করতে পারে সে। বয়সের তুলনায় তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। তার মনের মণিকোটায় অতীতের এলোমেলো অস্পষ্ট স্মৃতি যে মধুর স্বপ্নময় কাঠামো তৈরি করে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে শোনা কথা সেই কাঠামোকে মূর্তিতে পরিণত করে তোলে আর সে নিজে সবার অলক্ষ্যে কল্পনায় তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। একটা অব্যক্ত বেদনা দিনরাত তার অন্তরকে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। সে বুঝতে পারে না, সে এখন কি করবে? সমস্যাসংকুল জীবনাবর্তে কোনদিকে যাবে? কি করলে পাণ্ডবেরা আবার পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে? তবু সে উপলব্ধি করতে পারে প্রতিকারের জন্য একটা কিছু তাকে অবশ্যই করতে হবে।

সে যে ভারতবর্ষের অন্যতম বংশের উপযুক্ত সন্তান। পূর্বপুরুষদের স্বাভাবিক দাবিকে তো সে অস্বীকার করতে পারে না। বছরের পর বছর গুরুজনদের দুর্গতি আর অসম্মান ক্রমশ তার কাছে এত অসহনীয় হয়ে পড়েছে যে মুখ বুঝে দূরে দাঁড়িয়ে সে আর সহ্য করতে পারছে না। বীরাঙ্গনা জননী সুভদ্রার তত্ত্বাবধানে ও বীরশ্রেষ্ঠ মাতুল শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রশিক্ষায় ইতিমধ্যেই সে শৌর্যে-বীর্যে অনন্যতুল্য হয়ে উঠেছে। মহাকালের উদাত্ত আহ্বান সে যে প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে সেই আরব্ধ মহাকার্যকে সে সুসম্পন্ন করবে, শত চেষ্টা করেও তার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সে সর্বদা দিশেহারা, বিচলিত ও বেদনার্দ্র।

কোন সময়েই সে ভুলতে পারে না তার বংশ মর্যাদার কথা, পূর্ব-পুরুষদের অপরিসীম বীরত্ব আর অকল্পনীয় মাহাত্ম্যের কথা। মহারাজা শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সে দেখেছে। ভরতবংশতিলক বৃদ্ধ দেবব্রত দেবতুল্য মহাপুরুষ। তাঁর মতন বীর আর মহৎপ্রাণ সর্বকালে সর্বদেশে দুর্লভ। ও রকম মানুষ হয় না। যৌবরাজ্যে অভিষেকের পরে তিনি পিতার পুনর্বিবাহের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কেবলমাত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন নি, আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে চলেছেন। যৌবনের উন্মেষলগ্নের অশ্রুতপূর্ব বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে পিতার ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন বলেই তিনি পিতার কাছ থেকে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেছেন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়জয়ী ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য সাধারণ্যে ভীষ্ম নামে পরিচিত হয়েছেন। অস্ত্রগুরু অসীম শক্তিধর মহর্ষি পরশুরামকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি একদা যে আসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, আজও তা অব্যাহত রয়েছে। শত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েও অভূতপূর্ব ধৈর্য ও অসম্ভব তিতীক্ষাগুণে আজও তিনি কুরুবংশকে রক্ষা করে চলেছেন।

শান্তনুর পৌত্র পিতামহ মহারাজা পাণ্ডুকে সে দেখে নি, পুত্রদের শৈশবাবস্থাতেই তিনি পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুরবাসীরা আজও তাঁর গুণকীর্তন করে। বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। পিতা বিচিত্রবীর্যের ক্ষয়রোগে অকালে মৃত্যু হওয়ায় সিংহাসন শূন্য,

রাজ্য নৃপতিহীন, আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর পারস্পরিক সংঘর্ষ ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করছে। একাকী ভীষ্ম সমস্ত দিক সামাল দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় রেখেছেন। হস্তিনাপুরের রাজতন্ত্রের সেই পরম সঙ্কটময় মুহূর্তে কনিষ্ঠ হয়েও পাণ্ডু রোজ্যের রশ্মি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথভাবে সেই গুরুদায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন। তাঁর মনুষ্য চরিত্রজ্ঞান, ধীশক্তি ও বীরত্বের জন্য অচিরে সর্বপ্রকার সংঘাত বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ছোটভাইকে তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না। পাণ্ডু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সৌভ্রাত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর পরই ঘটে রাষ্ট্রকর্তৃত্বে সার্বিক বিপর্যয়। অবশ্য পাণ্ডবদের প্রতি ধার্তরাষ্ট্রদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঈর্ষাই এর মূল কারণ। এরই চরম পরিণতি কপট অক্ষক্রীড়া এবং পাণ্ডবদের বার বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাতবাস যাত্রা!

জ্যেষ্ঠতাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা ভাবলে ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে অভিমন্যুর। তাঁর মতন ধর্মের প্রতি একখানি অবিচল নিষ্ঠা, ঐকান্তিক অনুরাগ ও আন্তরিক ভালবাসা সে আর কারো দেখে নি। তাঁর নামের সঙ্গে 'ধর্মরাজ' বিশেষণ সার্থকভাবে প্রযুক্ত। বিশেষ্য আর বিশেষণের এরকম একাত্মতা বড় একটা নজরে পড়ে না। জীবিতকালেই তাঁর ধর্মনিষ্ঠা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কথায় এবং কাজে কোনও পার্থক্য ছিল না। ছলনা বা পরশ্রীকাতরতা বরাবরই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। ধর্মনিষ্ঠা ব্যতীত তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও সৎ ব্যবহার তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের অসাধারণ বীরত্ব অভিমন্যুর চিত্তে বিস্ময়ের উদ্রেক করে! অত বড় শক্তিশালী পুরুষ পৃথিবীতে আর নেই! অথচ শিশুর মত কি অপার্থিব সারল্যে ভরা তাঁর সমগ্র অন্তর! রাজনৈতিক জটিলতা, জাগতিক কূটনীতি ও বুদ্ধিদীপ্ত বাচনিক চাতুর্য তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারে না। কোনও প্রতিকূলতাকেই ভ্রূক্ষেপ করেন না তিনি। শত্রু যত শক্তিরই অধিকারী হোক না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে রুখে দাঁড়াতে তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত হন না। আরব্ধ কোনও কাজে বাধা পেলে, চলার পথে কোনও অন্তরায় দেখা দিলে এবং আত্মমর্যাদা একটুও আহত হলে, তিনি স্থানকালপাত্র বিবেচনা না করে প্রতিবাদে মুখর

হয়ে ওঠেন। তাঁর অপ্রতিহত বীর্যবত্তায় দুর্ধর্ষ হিড়িম্ব রাক্ষস মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছে, দুর্জয় বক রাক্ষসের জীবনাবসান ঘটেছে এবং দুর্বিনীত অত্যাচারী মগধাধিপতি জরাসন্ধ মৃত্যুবরণ করেছেন। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তিনি পূর্বদিকে দিগ্বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং একের পর এক গণ্ডক, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, লোহিত্য প্রভৃতি দেশ জয় করে আপন রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাঞ্চালরাজগৃহে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় সমগ্র ভারতবর্ষের সমবেত রাজন্যকুল তাঁর ও তাঁর ভাই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পরাক্রমে তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর হলেও তাঁর হৃদয় ছিল কুসুমের মত কোমল। অপরের বিন্দুমাত্র দুঃখকষ্টও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অন্যের বেদনায় তাঁর প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠত। কারো সামান্যতম সুখের জন্য স্বেচ্ছায় আত্ম-বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

পিতা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই অভিমন্যুর! সে যখনই চিন্তা করে তার পিতার মতন শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ সমগ্র ভারতবর্ষে বিরল, তখনই পিতৃগর্বে পুত্রের বুকখানা অপরিসীম আনন্দে ভরে ওঠে। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য তার পিতা। শিক্ষাকালে শিষ্যের একাগ্রতায় ও আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে গুরুদেব তাঁর নিজের অর্জিত সমস্ত বিদ্যা উজার করে দিয়ে তাঁকে সর্বপ্রকারে পারদর্শী করে তুলেছেন। তাঁর অপ্রতিহত বীরত্বকাহিনী ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণতি হয়েছে। বড় মা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিপতি শিশুপাল, মদ্রাধিশ্বর শল্য, কুরুপতি দুর্যোধন প্রভৃতি ভারতবর্ষের বড় বড় পরাক্রমশালী রাজারা কেউই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রক্ষিত ধনুর্বাণে জ্যা রোপন করে শূন্যে লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হননি। কিন্তু তার পিতা অবলীলাক্রমে তা বিদ্ধ করেছেন। অগ্নিদেবের অভিলাষ পূরণ করতে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচারণ করে ইন্দ্রপ্রস্তের রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বিশাল খাণ্ডববন পনের দিন ধরে দগ্ধ করে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করেছেন। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের আদেশে তিনি উত্তরদিকে দিগ্বিজয় যাত্রা করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর, কোকনদ, হাটক প্রভৃতি দেশ জয় করে পাণ্ডবদের আধিপত্য

বিস্তারে ব্রতী হয়েছেন। অনন্যতুল্য বীরত্বের জন্য একাধিক নামেরও অধিকারী তিনি। প্রত্যেকটি নাম আবার বিশেষ অর্থবহ। সে সব কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না অভিমন্যুর! তিনি শুভ বা নির্দোষ কার্য করেন বলেই অর্জুন, হিমালয় পর্বতে দিবাভাগে পূর্ব-ফাল্গুন ও উত্তরফাল্গুন নক্ষত্রের সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম বলেই তিনি ফাল্গুনী, যুদ্ধকালে দুর্ধর্ষ ও শত্রুবিজয়ী বলেই তিনি জিষ্ণু, দানব-বিজয়ের পরে দেবরাজ ইন্দ্র একটি সূর্যাভ কিরীট দ্বারা তাঁর মস্তক ভূষিত করেন বলেই তিনি কিরীটি, রণক্ষেত্রে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চারটি অশ্ব রথে সংযুক্ত থাকে বলেই তিনি শ্বেতবাহন, যুদ্ধের সময় কোন প্রকার নিন্দার কার্য বা বীভৎস কর্ম করেন না বলেই তিনি বীভৎসু, যুদ্ধে দুর্মদ বিপক্ষগণকে পরাজিত না করে ফেরেন না বলেই তিনি বিজয়, গায়ের রঙ সর্বজনপ্রিয় কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল বলেই তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম কৃষ্ণ, বাম এবং ডান উভয় হস্তেই গাণ্ডীব আকর্ষণে নিপুণ এবং বিকর্ষণে সমর্থ বলেই তিনি সব্যসাচী এবং একের পর এক জনপদ বলপূর্বক জয় করে সেখানকার ধন আহরণ করে সেই ধনের মধ্যে থাকেন বলেই তিনি ধনঞ্জয়। এই দশটি নাম ব্যতীত তিনি পার্থ নামেও সমধিক পরিচিত। যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা পৃথাকে তাঁর নিঃসন্তান পিসতুতো ভাই রাজা কুন্তিভোজ দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করাতেই পৃথার নাম হয়েছিল কুন্তী। পৃথা বা কুন্তীর তিন পুত্রই কৌন্তেয় নামে পরিচিত হলেও পৃথার পুত্র পার্থ বলতে কেবলমাত্র তৃতীয় পাণ্ডবকেই বোঝায়। আবার তিনি বনবাসকালে নিদ্রাকে সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন বলে গুড়াকেশ নামেও পরিচিত।

চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব নকুল আর সহদেবের কথাও বেশ মনে রয়েছে অভিমন্যুর। তাঁরা তার পিতার বৈমাত্রেয় ভাই। মহারাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মদ্ররাজ অতায়নের কন্যা মাদ্রীদেবীর যমক পুত্র তাঁরা। খুব ছেলেবেলায় তাঁদের মা স্বামীর চিতার সহমৃতা হলে বৈমাত্রেয় তিন ভাইয়ের সঙ্গে তাঁরাও কুন্তীদেবীর কোলে পিঠেই মানুষ হয়েছেন এবং তাঁকেই আপন মায়ের মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। দুই মায়ের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন চিরকাল অটুট, পারস্পরিক সৌহার্দ আর ভালবাসা ছিল অবিচ্ছেদ্য। বড় ভাইদের অসম্ভব মান্য করেন নকুল আর সহদেব। অন্যান্য পাণ্ডবদের মত তাঁরা বীরত্বে তেমন

খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁরাও যুদ্ধে কম পারদর্শী ছিলেন না। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে নকুল পশ্চিমাভিমুখে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করে শূরসেন, পাণ্ড্য প্রভৃতি বহু দেশ জয় করেন। শস্ত্রবিদ্যার থেকে শাস্ত্রবিদ্যাতেই সহদেবের অধিকার ছিল বেশি। সেইজন্য তিনি বড় যোদ্ধা অপেক্ষা বড় পণ্ডিত হিসাবেই সমধিক প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

নকুল আর সহদেব দুই কাকার মধ্যে সহদেবকেই অভিমন্যুর বেশি ভাল লাগে। রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক মানুষ তিনি, দোষ ও গুণ দুই-ই তাঁর চরিত্রে সমভাবে বর্তমান। সর্বোপরি তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী। গুরুজনদের অন্যায় অনুরোধকে তিনি যেমন মেনে নিতে পারেন নি কোনদিন, তেমনি তাঁদের নীতিবহির্ভূত অযৌক্তিক কাজের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেও তাঁর বাধে নি। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বলে বড়রা সবাই তাঁকে প্রীতির চোখে দেখেন। জননী কুন্তীদেবীও তাঁকে খুব স্নেহ করেন, নিজের ছেলেদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। এক মুহূর্তও তিনি তাঁকে না দেখে থাকতে পারেন না। বস্তুত, মাতৃহারা সহদেব ছিলেন কুন্তীদেবীর নয়নের মণি। তাই কৌরবদের সাথে পাশাখেলায় রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে যাত্রা করেন, তখন তিনি তাঁকে ভাইদের সঙ্গে বনবাসে যেতে দিতে চাননি। তিনি নিজের কাছে বিদুর গৃহে তাঁকে রাখতে চেয়েছেন এবং সেজন্য বার বার কতনা কাতর অনুনয়-বিনয় করেছেন। কিন্তু বনবাসে না গেলে পাছে বড় ভাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়—এই ভয়ে সহদেব জননীর স্নেহসিক্ত আন্তরিক আহ্বানকে উপেক্ষা করেছেন। এইভাবে মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করতে তিনি এতটুকু ইতস্তত করেন নি। আবার দাদার যুক্তিহীন অক্ষক্রীড়া আসক্তির জন্য বিনা দোষে বনবাসে যেতে হচ্ছে বলে তিনি ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে নিজের সারা মুখকে এমনভাবে কালিমালিপ্ত করেছেন যে যাতে কেউ যাত্রাকালে তাঁকে চিনতে না পারে।

পিতামহী কুন্তীদেবীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করে অভিমন্যু! তাঁর মতন আশ্চর্য চরিত্রের নারী তার নজরে আজও পরে নি। যে কোনও পরিস্থিতিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে এগিয়ে

চলার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। তিনি রাজকন্যা, রাজপালিতা, রাজবধূ ও রাজমাতা! এতখানি সৌভাগ্য খুব কম নারীর জীবনেই ঘটে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বোধহয় মনুষ্যজীবনে বিরল, কেননা সুখ ও দুঃখ দুই-ই অবিরত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। কুন্তীদেবীরও সুখের দিন চিরকাল রইল না। আলোর পরে অন্ধকার, অন্ধকারের পরে আলো—এটাই জাগতিক নিয়ম। সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে স্বামী পান্ডুর অকালমৃত্যুতে তাঁর সেই সুখের আলো চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেল। তারপর ভাগ্যের নিষ্করুণ পরিহাসে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছেন। এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের অবসান কবে ঘটবে—কে জানে! শত বিপর্যয়েও তাঁর মুখের হাসিটি কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে আর এইজন্যই তাঁকে অভিমন্যুর এত ভাল লাগে। তিনি বাৎসল্যময়ী মাতৃত্বের সর্বকালীন প্রতিভূ। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁর অপর্যাপ্ত স্নেহ ফল্গুধারার ন্যায় স্বতঃ উৎসারিত। আপন সন্তানদের উপর তাঁর যেমন স্নেহের অন্ত নেই, তেমনি পুত্র অর্জুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সূতপুত্র অঙ্গরাজ কর্ণের প্রতি তিনি পরম স্নেহ অনুভব করেন। ভীমের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ দেখে অনার্য রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বাকে তাঁর পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নিতে বাধে নি, আবার ছদ্মবেশে একচক্রানগরে বসবাস-কালে আশ্রিত ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখে কাতর হয়ে দুর্দান্ত বক রাক্ষসের বিরুদ্ধে তিনি প্রিয়পুত্র ভীমকে প্রেরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। ছেলেবেলায় ইন্দ্রপ্রস্থে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে পিতামহীর যে অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসা অভিমন্যু পেয়েছে, তা আজও তার অন্তরকে আকৃষ্ট করে। পাণ্ডবদের বনগমনের পরে তাঁর সাথে দেখা করতে সে দু-তিনবার মাতুল আর মায়ের সঙ্গে হস্তিনাপুরের মহামতি বিদুরের বাড়িতে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অদর্শনেও সেই স্নেহ ও ভালবাসার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি, উপরন্তু উত্তর পুরুষের প্রতি বাৎসল্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়েছে।

বড় মা দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে অভিমন্যুর বিস্ময়ের অবধি নেই! অনেক চেষ্টা করেও সে তাঁকে ঠিক বুঝতে পারে নি। তাঁর সম্বন্ধে যতই চিন্তা করে, ততই অবাক হয়ে যায় সে। বহু গুণের অধিকারিণী তিনি। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ যে কোনও নারীচরিত্রে থাকতে

পারে, তা অভিমন্যুর বুদ্ধিরও অগম্য। অসম্ভব তাঁর আকর্ষণীয় শক্তি। চুম্বকের মত মানুষকে কাছে টেনে এনে তিনি খুব সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। সকলের উপর তাঁর সমান, সতর্ক ও জাগ্রত দৃষ্টি ; অথচ কারো প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম প্রীতি ও অপর্যাপ্ত ভালবাসা সমভাবে বর্ষিত। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে অনায়াসে মাথা নত হয়ে আসে। অত্যন্ত প্রখর তাঁর মর্যাদাবোধ। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে রাজদুহিতা ও রাজমহিষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন সত্যি, কিন্তু কোন সময়েই আত্মসম্মান বিসর্জন দেন নি। পরিবেশের চাপে অবস্থাবৈগুণ্যে ও ভাগ্যবিপর্যয়ে যখনই সেই সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখনই তিনি আহত ফণিনীর মত গর্জন করে উঠেছেন। রাজসূয় যজ্ঞে বিরাট সাফল্যের পরে ইন্দ্রপ্রস্থের ভাগ্যাকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা! হস্তিনাপুরে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি পাপিষ্ঠদের চক্রান্তে কপট দ্যূতক্রীড়া ধর্মরাজ পরাজিত। রাজসভায় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি কৌরবপ্রধানেরা ; দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, সঞ্জয় প্রভৃতি বয়ঃবৃদ্ধেরা এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব উপস্থিত। সেই সময়ে মদগর্বী দুর্যোধনের আদেশে ঘৃণ্য দুঃশাসন রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে এনে সর্বজনসমক্ষে বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হলে তিনি একান্ত অসহায় হওয়া সত্ত্বেও তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। সমবেত রাজপুরুষেরা ও বয়ঃবৃদ্ধেরা কেউই তাঁর তখনকার তেজস্বীতাপূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নি।

মা সুভদ্রাকে অত্যন্ত ভালবাসে অভিমন্যু। প্রোষিতভর্তৃকা জননীর নয়নের মণি সে। মায়ের কঠোর তত্ত্বাবধানে তার বাল্য ও কিশোর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ছিলেন বীরাঙ্গনা রমণী, যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। পুত্র যাতে শৌর্যে-বীর্যে ও মানবিক চরিত্রগুণে ভবিষ্যতে পিতা অর্জুনের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেইজন্য তাঁর দিবারাত্র নিরলস প্রচেষ্টার সীমা ছিল না। মাতুল শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভাগিনেয় অভি-মন্যুকে পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সর্বপ্রকারে মনের মত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেও তার অস্ত্র-শিক্ষায় মায়ের অবদানও কম নয়। অসীম ধৈর্য অবলম্বন করে দিনের পর দিন তিনি কিভাবে পুত্রকে অস্ত্র অনুশীলনে সাহায্য করেছেন, তা

অভিমন্যুর স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে রয়েছে। মাতুলের শিক্ষানৈপুণ্য আর মায়ের নিরন্তর চেষ্টাতেই সে আজ ভারতবর্ষের অন্যতম ধনুর্বিদ। কোলাহল মুখর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মায়ের কথা চিন্তা করে সুগভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করে সে। মা যেমন পুত্রের অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত; পুত্রও তেমনি বীরাঙ্গনা মাতৃগর্বে গর্বিত। অপরের কাছে শোনা মায়ের অতীতজীবনের বীরত্বকাহিনী আজও তাকে অনুপ্রেরণা জোগায়, জীবন সংগ্রামের অগ্রগতিতে পাথেয় প্রদান করে।

মাতুলদের মধ্যে যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বাধিক শ্রদ্ধা করে অভিমন্যু। তাঁর অসীম ব্যক্তিত্ব, অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম মননশীলতার কাছে সুউন্নত মস্তকও আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। অসম্ভব তাঁর ধৈর্য আর সাহস। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি অবিচলিত চিত্ত। যে কোনও পরিস্থিতিকে খুব সহজেই মেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারেন তিনি। শত চিন্তা, শত উদ্বেগ, শত বিপর্যয়েও তাঁর মুখে সর্বদা মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রা যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেবের পুত্রকন্যা হলেও তাঁরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাইবোন। শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকী আর সুভদ্রার জননী রোহিণী। তিনি বলরামের সহোদরা। মা পৃথক হলেও ভাইবোনদের মধ্যে সুভদ্রার প্রতিই যে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ বেশি, তা অভিমন্যু বহুবার লক্ষ্য করেছে। মায়েরও তাই। বলরাম তাঁর আপন দাদা হলেও তিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রাণা। শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর কাছে বেদবাক্য, উপদেশ অবশ্য মান্য আর নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। তাই পাণ্ডবেরা বনবাসে যাত্রা করলে তিনি বিপদে পরে তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। পিতৃস্বসাপুত্র পরমাত্মীয় পাণ্ডবদের অকস্মাৎ বনবাসে শ্রীকৃষ্ণেরও দুঃখের অন্ত নেই। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কেবল তাঁর প্রিয়সখাই নন, প্রাণপ্রিয় ভগ্নীর স্বামী। তাই সখার অবর্তমানে কর্তব্যবোধে ভাগিনেয়কে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার সুকঠিন দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় বহন করে নিয়েছেন। অভিমন্যু যাতে ভবিষ্যতে পিতৃবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে পরিচিত হতে পারে, তার জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তার শিক্ষার দ্বারকাপুরীর বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছেন এবং স্বয়ং অস্ত্রশিক্ষা দান করে তাকে ভারতবর্ষের অন্যতম ধনুর্বিধ করে তুলেছেন।

অভিমন্যুর আজও মনে পরে ইন্দ্রপ্রস্থের মধুময় স্বপ্নাতুর দিনগুলির কথা! সেদিন তার বয়েস কতটুকুই বা! মাত্র পাঁচ বছরের শিশু সে! কত সুখ, কত আনন্দ, কত প্রাণপ্রাচুর্যেরই না ছড়াছড়ি এখানে সেখানে! পাণ্ডবদের সুশাসনে আর বীর্যবত্তায় ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য আর সম্পদই কেবলমাত্র দিনের পর দিন বর্ধিত হয় নি জীবনযাত্রার মান ও জীবনচর্চার বিভিন্ন দিকও উন্নীত হয়েছিল। বৈতালিকেরা মাঙ্গলিক সঙ্গীত গাইত, বন্দীরা দুবাহু তুলে জয়ধ্বনি দিত, ব্রাহ্মণদের আশীষবাণী উচ্চারিত হত, প্রজাবৃন্দ উল্লাস করত, যজ্ঞধূমে দিগন্ত ছেয়ে যেত, মন্দিরে মন্দিরে পূজাপাঠ ও আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠত। সর্বত্রই এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করত। অভিমন্যু আজও ভোলে নি পাণ্ডব বংশধর প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুত-কর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন, যৌধেয়, সর্বগ, সর্বগত নিরমিত্র, সুহোত্র প্রভৃতি ভাইদের কথা। তাদের আর তাকে নিয়ে ছোট ছোট শিশুদের যেন চাঁদের হাট বসে যেত রাজপুরীতে। মা, বড় মা ও অন্যান্য পুর-ললনাদের অপর্যাপ্ত স্নেহ, বাৎসল্যময়ী মাতামহীর অফুরন্ত ভালবাসা, পঞ্চ পাণ্ডব ও বয়ঃবৃদ্ধদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা কোনও কিছুরই বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। তারপর এল রাজসূয় যজ্ঞ! চতুর্দিকে সে কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা! আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ! অসংখ্য মানুষের আনা-গোনা! যজ্ঞের আগুন নির্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের ভাগ্যা-কাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠল। প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিবাত্তায় সব কিছু ওলোটপালোট হয়ে গেল। কুচক্রী দুর্যোধনের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে শকুনির কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবেরা রাজ্য ও ঐশ্বর্য সর্বস্ব হারিয়ে বার বছরের বনবাসে আর এক বছরের অজ্ঞাত বাসে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের শান্তির নীড় চিরদিনের জন্য ভষ্মী-ভূত হল!

পাণ্ডবদের জীবনে ঘনায়মান সেই দুর্যোগের অন্ধকার অমারাত্রির পর বেশ কয়েকদিন হল তের বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা এখন কি করছেন, কোথায় রয়েছেন, এমন কি আদৌ জীবিত আছেন কিনা—তাও অভিমন্যু জানে না। একটা অজানা আতঙ্কে তার বুকখানা সবসময়ে দুরু দুরু করতে থাকে। মনের কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে

না সে! অব্যক্ত বেদনায় তার চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে! সে এখন কি করবে—এই প্রশ্ন বার বার তাকে ব্যাকুল করে তোলে!

## ॥ দুই ॥

আষাঢ়ের কৃষ্ণা চতুর্দশী! অনেক রাত হয়েছে! কিছুক্ষণ আগে রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ মিনার থেকে দ্বিতীয় প্রহর সূচক ঘণ্টাধ্বনি হয়ে গেল। নক্ষত্রখচিত স্বচ্ছ আকাশ। ভাসমান গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘপুঞ্জের মাঝে চন্দ্র দীপমান। তার অপূর্ব কিরণচ্ছটায় সমুদ্রমেখলা সমগ্র দ্বারকাপুরী উদ্ভাসিত। রাজপ্রাসাদ, সৌধশ্রেণী, সুসজ্জিত উদ্যানসমূহ, বাপীতটরেখা, পর্বতশিখরমালা, শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্যানী ও দিগন্ত বিস্তৃত উত্তাল নীলাভ ঊর্মিমালার উপর সেই আলোক রশ্মি পতিত হয়ে এক স্বর্গীয় মোহময় মায়াজাল বিস্তার করেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই। সমগ্র লোকালয় ঘুমে আচ্ছন্ন। সর্বত্র একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করছে। কেবল থেকে থেকে নিশাচর প্রাণীর চিৎকার আর আর রাতজাগা পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বর সে নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান খান করে দিচ্ছে।

এত রাত হয়েছে, তবু শ্রীকৃষ্ণের চোখে ঘুম নেই। কক্ষসংলগ্ন ঘেরা প্রাঙ্গনে ব্যাঘ্রাসনে বসে তিনি অত্যন্ত মানাযোগের সঙ্গে কি যেন আঁক জোখ করছেন। তিনি গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন, তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে সুগভীর বলিরেখা অঙ্কিত। তাঁর ওষ্ঠাধরে সর্বদা বিরাজিত স্মিতহাস্য আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। বিক্ষুব্ধ অন্তরকে তিনি কিছুতে শান্ত করতে পারছেন না। লেখার প্রতি একান্ত আবিষ্ট হয়েও তিনি বেশিক্ষণ মনোসংযোগ করে থাকতে অপারগ হচ্ছেন। বার বার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু সমস্ত উদ্যম বার বার ব্যর্থতার পর্যবশিত হচ্ছে। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি মূল সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। ক্রমশ বিচলিত হয়ে উঠছেন তিনি। এক একবার উঠে তিনি প্রাঙ্গনময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে নির্মেঘ আকাশের দিকে মুখ তুলে স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন।

শ্রীকৃষ্ণের আজকের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পঞ্চ পাণ্ডব। রাজ্যচ্যুত বনবাসী পাণ্ডবদের অবস্থার কথা ভেবেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছেন। আঠারদিন আগে তাঁদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। অথচ সুদীর্ঘকালের মধ্যে দ্বারকাপুরীতে তাঁদের কোনও সংবাদ এসে পেঁছোল না। তাঁদের খবর পাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগের শেষ নেই। প্রতি মুহূর্তেই তিনি তাঁদের শুভসংবাদ প্রত্যাশা করছেন। সময় যত অতিক্রান্ত হচ্ছে, তাঁর উৎকণ্ঠা তত প্রকট হয়ে পড়ছে। আবার এতদিন সংবাদ না আসার কারণও তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পাণ্ডবেরা এখন কোথায় রয়েছেন, কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন, কি করছেন, কেমন আছেন, নতুন করে কোনও বিপদে পড়েছেন কিনা—কিছুই তিনি জানেন না। এক এক করে অতীতের কত ঘটনাই না তাঁর মনে উদিত হতে লাগল। হস্তিনাপুরের রাজতন্ত্রকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। রাজা দুর্যোধন আর তাঁর অনুগামী সাঙ্গপাঙ্গেরা মহাপাপিষ্ঠ। এ সংসারে এমন কোনও কাজ নেই, যা তাঁদের অকরণীয়। কোন প্রকার রীতিনীতি বা আদর্শের বালাই তাঁদের নেই। কূটবুদ্ধিতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। ছলে, বলে কিংবা কৌশলে যে ভাবেই হোক না কেন, আরব্ধ কার্য সমাধা করতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা করেন না। যে কোনও উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি হলেই হল। অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছানোটাই তাঁদের কাছে বড় কথা!

কিন্তু পাণ্ডবেরা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেবলমাত্র ধার্মিক প্রবণই নন, তিনি আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ নৃপতি। সব কিছুকই তিনি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেন। কোন রকম কূটনীতি বা ছলচাতুরী তিনি একেবারেই বোঝেন না। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন দৈহিক শক্তিতে অদ্বিতীয় হয়েও সরলতায় দাদার চেয়ে কম যান না। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ধরণীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হলেও বীরত্বের তুলনায় তাঁরও মাঝে মাঝে কূটনৈতিক জ্ঞানের স্বল্পতা দেখা যায়। নকুল বা সহদেব বীরত্বে জ্যেষ্ঠদের সমকক্ষ তো আদৌ নয়, পরন্তু সহদেব আবার যোদ্ধা অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। পাণ্ডবদের চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কাউকেই তাঁরা অবিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেন না। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস। বার

বার কৌরবদের হীন চক্রান্ত জালে জড়িয়ে এই বিশ্বাসের মূল্য তাঁদের কম দিতে হয় নি।

কৌরবেরা পাণ্ডবদের চিরশত্রু। দুর্যোধনের জন্মলগ্ন থেকেই এই শত্রুতার সূত্রপাত। তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বে বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র আর ছোট ভাই পাণ্ডুর মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। পারস্পরিক প্রীতি ও সৌভ্রাত্রবোধ ছিল অটুট। এমন কি, বড় হওয়া সত্ত্বেও জন্মান্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র যখন হস্তিনাপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন এবং পাণ্ডু সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখনও এর এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি। বড় ভাইয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও স্নেহ যেমন অজস্রধারায় বর্ষিত হত ছোট ভাইয়ের উপর, ছোট ভাইও তেমনি ছিলেন দাদা-অন্ত-প্রাণ। দাদার উপর ছিল তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। দাদাকে জিজ্ঞাসা না করে, দাদার সঙ্গে পরামর্শ না করে ও দাদার উপদেশ না নিয়ে তিনি কোন কাজ করতেন না। জন্মান্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারী। রাজ্য-পরিচালনায় রাজনৈতিক যে চাতুর্য ও কূটবুদ্ধি একান্ত অপরিহার্য, তাঁর অপর্যাপ্ত ছিল। পাণ্ডুও তাঁর দূরদর্শী সূক্ষ্ম কূট-নৈতিক বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। দাদার প্রতিটি উপদেশ পরামর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। কিন্তু দুর্যোধনের জন্মানোর পর থেকে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। সকলের অলক্ষ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল! ক্রমশ তা ঈর্ষায় রূপান্তরিত হল!

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র হলেও পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর থেকে বয়সে বড়। মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—হস্তিনাপুর রাজবংশের এটাই প্রচলিত প্রথা। যুধিষ্ঠির কেবলমাত্র মহারাজা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্রই নন। তার উপর তিনি আবার বংশধরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সুতরাং তিনিই যে হস্তিনা-পুরের সঙ্গত ভাবী মহারাজা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সিংহাসনের উপর তাঁর দাবিই সর্বজনস্বীকৃত। পার্শ্ববর্তী রাজ্য-গুলি বিশেষ করে সমগ্র দেশবাসী তাঁরই সমর্থনে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ধারণা হল যে তিনি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতেন, তবে তাঁর পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তিতে কোন প্রকার অসুবিধা হত না। তখন তাঁর পুত্রই মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র হতেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আর কাকে বলে! বিধি বাম! ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও তিনি জন্মান্ধ বলে সিংহাসন থেকে চিরবঞ্চিত আর সেই কারণেই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রেরও সিংহাসনের উপর কোনও অধিকার নেই।

ধৃতরাষ্ট্র স্নেহপ্রবণ পিতা! ভবিষ্যতে পুত্রের রাজ্যলাভ অসম্ভব জেনে তাঁর স্নেহ তাঁর স্নেহাতুর পিতৃহৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বারংবার তাঁর মনে হতে লাগল, ভাইকে ভালবেসে তিনি আত্মজ সন্তানের প্রতি অন্যায় করেছেন। পাণ্ডুর রাজ্যাধিকারে যদি তিনি বিরোধিতা করতেন, তাহলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না। হস্তিনাপুরের রাজবৃত্তের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হত। রাজ্যের অধিকার থেকে দুর্যোধনকে বঞ্চনার মূলত তিনিই স্বয়ং দায়ী—এই বিশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের বদ্ধমূল হয়ে উঠল। একদিকে পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ আর অন্যদিকে পাণ্ডুর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য তাঁর অন্তরে হিংসার উদ্রেক করল এবং ধীরে ধীরে তা পাণ্ডববিদ্বেষে পরিণত হল। ধৃতরাষ্ট্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে মহারাজ পাণ্ডুর অকালমৃত্যু, কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রদেবীর সহমরণ এবং পাণ্ডবদের নাবালকত্ব তাতে ঘৃতাহুতি দিল।

পাণ্ডুর তিরোধানের পরে হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক অবস্থা অকস্মাৎ পরিবর্তিত হল। পৌত্রের অকালমৃত্যুতে বিপর্যস্তা স্নেহময়ী মহারাণী সত্যবতী জীবনের অনিত্যতায় বিচলিত হয়ে পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে নিয়ে রাজপুরী পরিত্যাগ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গভীর অরণ্যে চলে গেলেন। তাঁরা আর সংসারজীবনে ফিরে আসেন নি কোনদিন, সেখানে বসবাসকালেই তাঁদের দেহাবসান ঘটে। এবার ধৃতরাষ্ট্রের ভাগ্যচক্র দ্রুত আবর্তিত হল। চিরকুমার ভীষ্ম কোনও অবস্থাতেই সিংহাসনে বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির নাবালক হওয়ায় রাজ্যলাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অথচ রাজ্য নৃপতিহীন, একটা বিরাট শূন্যতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। পূর্ববর্তী মহারাজা বিচিত্রবীর্যের পরলোকগমনের পর রাজ্যশাসনে যে অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, মহারাজা পাণ্ডুর অকালপ্রয়াণের ফলে সেই একই ঘটনা পুনরাবৃত হল। তবে পার্থক্য এই বিচিত্রবীর্য মৃত্যুকালে অনপত্য ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডুর পাঁচজন শিশুপুত্র বর্তমান। সকলের দৃষ্টি তখন ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিই আকৃষ্ট হল। তিনি জন্মান্ধ হলেও বিচক্ষণ,

বলক্ষাণ শক্তিশালী ও তীক্ষ্ম ধীশক্তিসম্পন্ন কুটনীতিবিদ্। সমস্ত দিক থেকে উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেবল দৃষ্টিহীনতার জন্যই তিনি একদা রাজ্যের অধিকার লাভ করতে পারেন নি। সে সময় রাজকুমার পাণ্ডু জীবিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর অবর্তমানে অবস্থায় যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছে। তখন অনন্যোপায় হয়ে মহাবীর ভীষ্ম রাজঅমাত্য বিদুর, সঞ্জয় ও অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরের শূন্য রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

রাজ্যলাভ করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের স্বার্থরক্ষায় আর পাণ্ডবদের সর্বনাশ সাধনে বদ্ধ পরিকর হলেন। এই সময়ে তাঁর শ্যালক গান্ধার রাজপুত্র কুচক্রী শকুনির হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর আগমনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। তিনি ছিলেন নষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত ভ্রাতার প্রধান পরামর্শদাতা ও অন্যায় কার্যাবলীর অন্যতম পৃষ্টপোষক। ধৃতরাষ্ট্র কেবলমাত্র জন্মান্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুত্রস্নেহেও অন্ধ। 'অন্ধ তিনি অন্তরে বাহিরে চিরদিন।' বহিঃচক্ষু উন্মীলিত হয়ে যেমন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে নি কোনদিন, অতিরিক্ত পুত্রস্নেহে তেমনি তাঁর অন্তর্চক্ষুও নিমীলিত ছিল চিরকাল। সেইজন্য বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ দু'দিক থেকেই তিনি ছিলেম অন্ধ। দিনের পর দিন পাণ্ডবদের উপর দুর্বিনীত পুত্রদের অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণে কোন প্রকার বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বুঝতে পারলেও তিনি স্নেহের আধিক্যে আর পাণ্ডববিদ্বেষে এর বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ পর্যন্ত করতেন না। উপরোন্তু তাদের প্রত্যেকটি অনভীপ্সিত কাজ কখনও পরোক্ষভাবে আবার কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সমর্থন লাভ করত।

যুধিষ্ঠিরের প্রবল ধর্মাসক্তি, ভীমের অমিত বীর্যবত্তা, অর্জুনের ধনুর্বিদ্যায় অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা, নকুলের জ্যেষ্ঠদের প্রতি ভক্তি ও সহদেবের শাস্ত্রজ্ঞান বাল্যকালেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাজঅমাত্যেরা এবং অন্তঃপুরবাসিনী পুরমহিলারা তাঁদের আচার-আচরণে ও আলাপ-ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। সবাই তাঁদের প্রীতির চোখে দেখতেন। রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য সর্বদা ভীমের শক্তিমত্তা ও অর্জুনের ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্যের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ ছিলেন। নরনারী নির্বিশেষে পৌর নাগরিকবৃন্দও পাণ্ডবদের প্রশংসা

করত। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের কাছে পঞ্চ পাণ্ডবের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্রেরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ঈর্ষা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। শক্তিতে ও পরাক্রমে পাণ্ডবদের সমকক্ষতা লাভ করতে না পেরে তাঁরা ক্রমশ নীতিবহির্ভূত কূটকৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিলেন। অতীতের সেই সব কলঙ্কিত ঘটনা আজ আর কারো অজানা নয়। অতীতের যবনিকার অন্তরাল বিদূরিত করে একে একে সমস্ত কাহিনী যেন চিন্তাক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একবার কৌরবেরা ভীমের অসাধারণ দৈহিক শক্তিতে চিন্তান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গঙ্গাস্নানের নাম করে কৌশলে বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিলেন। সে যাত্রায় দৈবক্রমে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। আর একবার রাজউদ্যানে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, অমাত্যবৃন্দ, পুরমহিলারা ও পুরবাসীরা সবাই উপস্থিত। সেদিন আচার্য দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের এক বিরাট অস্ত্র পরীক্ষার আয়োজন করেছেন। অর্জুনের পুনঃপুন ধনুর্বিদ্যায় কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি যখন বারংবার প্রিয় শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন, তখন মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশে অসমর্থ ঈর্ষাতুর ধার্তরাষ্ট্রেরা মনে মনে রাগান্বিত হয়ে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। এমন সময় মহাবীর কর্ণের সেখানে আকস্মিক উপস্থিতি আর নির্ভীকভাবে অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানে বেশ কিছুটা দেখতে পেলেন তাঁরা। কিন্তু কর্ণ সূত দম্পতি অধিরথ ও রাধার পুত্র বলে এবং কোনও দেশের রাজা বা রাজপুত্র না হওয়ার সমবেত রাজপুরুষেরা একবাক্যে এই অসম প্রতিযোগিতার প্রতিবাদ করে উঠলেন। রাজকুমার দুর্যোধন তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক দেহসৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হয়ে অর্জুনের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে তাৎক্ষণিক উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তিনি তাঁকে অঙ্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম অন্তরায় দূর করলেন বটে, কিন্তু এত করেও তাঁর মনোবাসনা চরিতার্থ হল না। কর্ণকে দেখে মহারাণী কুন্তীদেবী হঠাৎ মূর্ছিতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের মত প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেল।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। পুত্রস্নেহপ্রবণ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে ক্রমবর্ধমান পঞ্চ পাণ্ডবকে সমূলে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে একটা বিরাট দুষ্টচক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দুর্যোধন ও দুঃশাসন ছিলেন এর অন্যতম হোতা, অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রেরা হলেন তার সমর্থক এবং সূতপুত্র মহাবীর কর্ণ ও সুবলনন্দন পাপাত্মা শকুনি তার প্রধান উপদেষ্টা। এই চক্রান্তে মাতুল শকুনির তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর বন্ধু কর্ণের বীর্যবত্তার উপর দুর্যোধন সর্বাপেক্ষা বেশি আস্থা পোষণ করতেন। তাঁরা একাধিক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে অনেক পরামর্শ করে রাজকর্মচারী পুরোচনকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকোচ প্রদান করে বশীভূত করলেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে রাজধানী থেকে বহুদূরে অবস্থিত বারণাবত নগরে সর্বপ্রকার দাহ্যপদার্থ দিয়ে এক মনোরম জতুগৃহ নির্মাণ করলেন। বারণাবত দেবাদিদেব বিশ্বনাথক্ষেত্র, হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থভূমি। সেখানে জতুগৃহে জননী কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবদের এক সঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে মারার উদ্দেশ্যে পুত্রদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্নেহান্ধ অন্ধ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র তীর্থযাত্রার জন্য তাঁদের বার বার প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। সে সময়ে যুধিষ্ঠির প্রাপ্তবয়স্ক হন নি সত্যি, কিন্তু বরাবরই তিনি স্থিতধী ও ধর্মপ্রাণ। আপন প্রজ্ঞাবলে তিনি সহজেই জ্যেষ্ঠতাতের অসৎ অভিসন্ধির কথা অনুমান করতে পারলেন। তাঁর কাছে যা তাৎক্ষণিক অনুমান সর্বস্ব অস্পষ্ট মাত্র ছিল, একদা রাজঅমাত্য ক্ষত্তা বিদুর যখন সকলের অজ্ঞাত ম্লেচ্ছভাষায় তাঁকে সেই আসন্নবিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন, তখন সব পরিস্কার হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁদের প্রতি প্রজাবৃন্দের অত্যধিক আসক্তির জন্যই ধার্তরাষ্ট্রদের এই সুপরিকল্পিত সচেতন হত্যাপ্রয়াস। রাজধানী বা নিকটবর্তী কোনও স্থানে পাণ্ডবদের জীবনহানি ঘটলে জানাজানির ফলে পাছে প্রজাপুঞ্জ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, সেইজন্যই দূরান্তরিত বারণাবতে হত্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন শক্তিহীন আর সমগ্র রাজশক্তি ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। শক্তিহীনের পক্ষে রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কেবলমাত্র অশোভনই নয়, অবিবেচনার কাজও বটে। এর পরিণতি কখনো ভাল হয় না। তাই সমস্ত দিক চিন্তা করে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভাইদের আর মাকে নিয়ে বারণাবতে গমন করলেন এবং পুরোচন নির্মিত জতুগৃহে বসবাস করতে লাগলেন। পুরোচনের যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এইভাবে সেখানে

এক বছর সদাসর্বদা সজাগ ও সতর্ক হয়ে অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে বিদুর প্রেরিত খনকের সাহায্যে রাতের গভীরে কক্ষের অভ্যন্তরে সুদীর্ঘ সুরঙ্গপথ খননকার্য সমাপ্ত হলে তাঁরা নিজেরাই একদিন জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে ঐ পথে পলায়ন করেন। সেখানকার ভয়ঙ্কর অগ্নি-শিখায় পুরোচন এবং পঞ্চপুত্রসহ এক ব্যাধ রমণী ভস্মীভূত হয়। ব্যাধ পরিবারের দগ্ধ হওয়ার সংবাদকে কুন্তীদেবী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মৃত্যু হয়েছে মনে করে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধিতে কৌরবেরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ওদিকে সর্বহারা পাণ্ডবেরা জননীকে নিয়ে পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন ধরে যাযাবরের মত বন থেকে বনান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অনেক দুঃখকষ্ট ভোগের পর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, তখনই তাঁরা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন।

পিতৃস্বসা পৃথাদেবীর পুত্র হলেও পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের এ সব সংবাদ বৃষ্ণিকুলতিলক যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে সম্যক অবগত ছিলেন না। এমন কি এর আগে তাঁর সঙ্গে তাঁদের চাক্ষুষ কোনও পরিচয়ই ঘটে নি। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চাল অধিপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রিত হয়েই তিনি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে প্রথম মিলিত হন। অবশ্য পিতৃস্বসা মহারাণী পৃথাদেবী ও হস্তিনাপুর নৃপতি পাণ্ডু সম্বন্ধে তিনি জানতেন, স্বামীর অকালমৃত্যুতে নাবালক পুত্রদের নিয়ে তাঁর বিষাদমলিন দুঃখের কিছু কিছু কাহিনীও তিনি শুনেছেন। কিন্তু কৌরবদের দ্বারা তাঁদের নিগ্রহের কাহিনী যে এত নিষ্করুণ, তা তিনি পূর্বাহ্নে কল্পনাও করেন নি। জানতে পারলে হয়ত এর কিছুটা প্রতিবিধান করতে পারতেন। বিষদভাবে এসব তথ্য তিনি পরে সংগ্রহ করেছেন। স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদে অপারগ পরশ্রীকাতর সমবেত রাজন্যকুলের অন্যায় যুদ্ধে অর্জুনের অসাধারণ বীরত্ব ও ভীমের দুর্ধর্ষ পরাক্রম তাঁকে মুগ্ধ করেছে। একচক্রানগরে কুম্ভকার গৃহে প্রথম সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতা ; নকুল ও সহদেবের জ্যেষ্ঠানুগত্য এবং কুন্তীদেবীর সারল্যে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। নিকট আত্মীয়ের ঐরূপ চরিত্রমাধুর্যে তিনি একদিকে যেমন গৌরব অনুভব করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের জ্ঞাতিগঞ্জনার দীর্ঘকালীন ইতিবৃত্ত

তাঁর স্পর্শকাতর অন্তরকে স্বাভাবিকভাবে বেদনাবিদুর করে তুলেছে। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁর দুর্লভ আকর্ষণী শক্তিতে সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। পিতৃস্বসা কুন্তীদেবী আর বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে তিনি নিবেদন করেছেনআন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর স্থাপিত হয়েছে সখ্যতা, নকুল ও সহদেবের উপর তিনি বর্ষণ করেছেন অজস্র আশীর্বাদ এবং পাণ্ডুকুলবধূ নবপরিণীতা দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর স্থাপিত হয়েছে প্রিয়সখি সম্পর্ক।

পাণ্ডবদের পরবর্তী কোনও ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। সমস্ত কাহিনীর সঙ্গেই তিনি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। পাণ্ডব-রাজলক্ষ্মী দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। অপসৃত ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হন। নতুন বৈবাহিক সূত্রে বিশাল পাঞ্চালরাজ্যের সহায়তা লাভ করেএবং পুরোনো আত্মীয়তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ পরিচালিত বিরাট যাদবসঙ্ঘের সাহায্য পেয়ে রাজ্যহারা নিঃসম্বল পাণ্ডবেরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সমকালীন ভারত-বর্ষের দুটি বৃহত্তম রাজ্যের সমর্থনে নববলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা দীর্ঘকাল পরে শুভলগ্নে পাঞ্চালনগরে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং হস্তিনাপুরে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত প্রেরণ করে তাঁদের পৈত্রিক সিংহাসনের দাবি জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রেরা বারণাবতের চক্রান্তের ব্যর্থতায়, পাঞ্চালরাজ্যে ভীমার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে সমবেত রাজন্যবর্গের পরাজয়ে এবং পাণ্ডবদের বর্তমান শক্তিবৃদ্ধিতে এতদূর ভীত, ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তাঁরা আর কোনও রকম বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করলেন না। তবু পুত্রদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে কূটনীতিবিদ ধৃতরাষ্ট্র সমগ্র হস্তিনাপুর রাজ্য দুভাগে বিভক্ত করে সিংহভাগ কৌরবদের অধিকারে রেখে অবশিষ্টাংশ পাণ্ডবদের অর্পণ করে শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী হলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের জনবহুল সমৃদ্ধশালী সুপ্রাচীন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে অভিষিক্ত করলেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের অরণ্যসঙ্কুল পর্বতাকীর্ণ অনুর্বর খাণ্ডবপ্রস্থ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। নীতি-বহির্ভূত ধৃতরাষ্ট্রের এই অসমবণ্টনে পাণ্ডবদের আপত্তি করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাসুদেবের কথায় তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বহুদিনের সংকল্প ছিল পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট ধর্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এর জন্য দীর্ঘকাল তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তাঁর মনের মতন আদর্শ পুরুষের অনুসন্ধান করেছেন,— যিনি শৌর্যে-বীর্যে মহত্ত্বে-সারল্যে সত্যবাদিতায় ও ধর্ম-প্রাণতায় লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হবেন, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতি-বর্ণ ধনী-দরিদ্র ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের ধর্মমুখী অগ্রগতির পথ সুগম হবে। পাঞ্চালরাজ্যে স্বয়ম্বর সভাতেও আমন্ত্রিত হয়ে এই উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। এখানে পাণ্ডবদের মধ্যেই তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট আদর্শমানবের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর অন্তরে দীর্ঘদিন পোষিত সুপ্ত আশার পুনরুজ্জীবন ঘটল। পঞ্চ পাণ্ডবের কেন্দ্রীয় পুরুষ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আরব্ধ কার্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করে তিনি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন। তারপরে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে আর শুভেচ্ছায় অক্লান্ত পরিশ্রমী পাণ্ডবদের ক্রমোন্নতি ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। সুরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশে ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানী স্থাপন, প্রজাপুঞ্জের বর্ণ ও কর্মগত জনপদ বিন্যাস, সৌভ্রাত্রবর্ধনে স্বেচ্ছানির্বাসিত অর্জুনের ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা, পাণ্ডব ও যাদবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সৌহার্দবৃদ্ধিতে তৃতীয় পাণ্ডবের বসুদেব দুহিতা সুভদ্রাহরণ, পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী হিংস্র শ্বাপদসংকুল ও অনার্য বনচর সম্প্রদায় অধ্যুষিত দুর্গম বিশাল খাণ্ডবারণ্য দাহন, দানবস্থপতি ময় কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে অমরাবতী নিন্দিত মনোমুগ্ধকর বিরাট সভাগৃহ নির্মাণ, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের দ্বারা অত্যাচারী মগধরাজ জরাসন্ধ বং, ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেবের যথাক্রমে পূর্ব উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে দিগ্বিজয়যাত্রা, রাজচক্রবর্তী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যয়বহুল রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় কার্যাবলীতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, তাঁরই সুচিন্তিত পরামর্শে ও আন্তরিক সহযোগিতায় সমস্ত কার্য ভালভাবে সম্পাদিত হওয়ায় পাণ্ডবেরাও ক্রমশ সর্ববিষয়ে তাঁর উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন।

রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরে হস্তিনাপুর রাজসভায় অনুষ্ঠিত দু' দুবার কপট দ্যুতক্রীড়া সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কিছুই জানতে পারেন নি। তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই এর আয়োজন করা হয়েছিল। যজ্ঞে

উপনীত দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবেরা পাণ্ডবদের অভূতপূর্ব সম্পদ, অপরিসীম ঐশ্বর্য, অপর্যাপ্ত জনবল ও সর্বভারতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের সর্বনাশ সাধন করে সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অক্ষক্রীড়াবিদ শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের ছলনা করে সর্বস্বান্ত করতে প্রতিশ্রুত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বারংবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের কোনক্রমে নিরস্ত করতে না পেরে ক্ষত্তা বিদুরকে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। অক্ষক্রীড়া ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা যে কোনও রাজার পক্ষে একদিকে যেমন অগৌরবের, অপরদিকে তেমনি রাজকীয় মর্যাদার পরিপন্থী। বিশেষ করে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করে যুধিষ্ঠির রাজ-চক্রবর্তী পদে উন্নীত হয়েছেন। তাই তিনি কৌরবদের আকস্মিক আহ্বানে চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কি করবেন বুঝতে না পেরে তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে উঠলেন। সুপরামর্শের আশায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে দ্বারকাপুরীতে একাধিক দূত প্রেরণ করেও কোনও সংবাদ পেলেন না। সমস্ত বিষয় স্থিতধী হলেও তিনি ছিলেন অতিরিক্ত দ্যূতাসক্ত। সেইজন্য বেশ কয়েকদিন দোলাচল মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে চক্রান্তের বেড়াজালে বিজড়িত হয়ে পড়লেন। প্রথমবারের অক্ষক্রীড়ায় পণবদ্ধ পাণ্ডবেরা রাজ্য-ঐশ্বর্য-সম্পদ সর্বস্ব হারিয়ে কৌরবদের ভৃত্যে পরিণত হলেন আর প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ মহারাণী দ্রৌপদীর ভাগ্যে জুটলো অকথ্য অপমান ও নিদারুণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। সেবারে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষণকালীন দুর্বলতার সুযোগে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবেরা নিষ্কৃতি লাভ করলেন। কিন্তু অবিবেচনা প্রসূত দ্বিতীয়বারের অক্ষক্রীড়ায় পুনরায় পরাজিত হয়ে তাঁরা কৌরবদের রাজ্য প্রদান করে বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কাম্যকবন অভিমুখে গমন করলেন।

পাণ্ডবদের গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়ে দুঃখময় বিড়ম্বিত জীবন আরম্ভ হবার অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণ এই মর্মন্তুদ সংবাদ অবগত হয়েছেন। এরও মূল উৎস রাজসূয় যজ্ঞ। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে মহারাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকে

শ্রেষ্ঠমানব বলে বরণ করলে বৃষ্ণিবংশীয় চেদিপতি দুর্বৃত্ত শিশুপালের নেতৃত্বে কিছু কিছু রাজা তার বিরোধিতা করেন। শিশুপাল ছিলেন পূর্বতন চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র আর তাঁর জননী ছিলেন বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবা। পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবার কাছে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুত ছিলেন যে তাঁর পুত্রের শত অপরাধ তিনি মার্জনা করবেন। কিন্তু যজ্ঞ স্থলে শিশুপালের অপরাধ ঐ সংখ্যা অতিক্রম করায় তিনি সুদর্শনচক্রের দ্বারা তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন। সৌভনগরাধিপতি শাল্ব বন্ধু হত্যায় রাগান্বিত হয়ে প্রতিহিংসা বাসনায় সকলের অজ্ঞাতে যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ করে তাঁর বিখ্যাত সৌভযানে আরোহণ করে জল স্থল ও অন্তরীক্ষ থেকে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করলেন। সে সময়ে দ্বারকাপুরী এক রকম অরক্ষিতই ছিল বলা চলে। তৎকালীন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় আশু যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের উপর নগর-রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে অধিকাংশ যাদববীরেরা তখন ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করছেন। মায়াযুদ্ধে পটু শাল্ব হঠাৎ আক্রমণ করায় শাম্বের পক্ষে তা আদৌ প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে উঠল। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি বালকবৃদ্ধ নরনারী নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি হত্যা করে সমগ্রদ্বারকা-পুরী মহাশ্মশানে পরিণত করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণ এই অকল্পিত মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি মায়াবী শাল্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং অনেকদিন সংগ্রাম করে তিনি তাঁকে নিহত করলেন। হস্তিনাপুরে অক্ষক্রীড়ার সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি যেমন পাণ্ডবদের কোনও সংবাদ রাখতে পারেন নি, তেমনি যুধিষ্ঠির প্রেরিত কোনও দূতের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি, যখন তিনি সব সংবাদ অবগত হলেন তখন আর কিছু করণীয় নেই। তবু তিনি ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে ছুটে গিয়েছেন কাম্যকবনে পাণ্ডবদের কাছে, সমস্ত বিষয় বিষদভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন। আরও দু'বার তাঁর সাথে তাঁদের দেখা হয়েছে। একবার তিনি বিপন্না দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে দ্বৈতবনে সাক্ষাৎ করতে যান, আর একবার বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে পাণ্ডবেরা প্রভাসতীর্থে এলে তিনি যাদবপ্রধানদের ও পুরমহিলাদের নিয়ে পরস্পর মিলিত হন। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী রাণী সত্যভামাও একবার সুভদ্রা, অভিমন্যু ও

অন্যান্য যাদবরমণীদের নিয়ে দ্বৈতবনে দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বনবাসের বার বছর শ্রীকৃষ্ণ নিয়মিত পাণ্ডবদের খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর নিজের পক্ষে সব সময় উপস্থিত হয়ে খবরাখবর নেওয়া সম্ভবপর ছিল না বলে তিনি বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। এরা প্রতিনিয়ত পাণ্ডবদের সংবাদ তাঁকে পরিবেশন করত এবং তাঁর পরামর্শ তাঁদের নিবেদন করত। এইভাবেই তিনি পারস্পরিক যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁরই কথায় বনবাসকালে পাণ্ডবেরা কৌরবদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সহানুভূতি ও নিকটসান্নিধ্য লাভের অভীপ্সায় বিভিন্ন রাজ্য ; গয়া, কৌশিকী, বৈতরণী. প্রভাস, সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র এবং মহেন্দ্রপর্বত, কৈলাস পর্বত, গন্ধমাদন পর্বত, বদরিকাশ্রম, বৃষ পর্বাশ্রম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যে প্রভূত সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যাঁদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হয়েছেন, সামান্যতম আলাপ-পরিচয় হয়েছে বা ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছে ; সকলেই তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন এবং বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য সমবেদনা জানিয়েছিল। মানুষ যে কতখানি নীচ, স্বার্থপর ও অহঙ্কারী হতে পারেন ; কৌরবদের হীনজনোচিত ঘৃণ্য কার্যকলাপে তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। পাণ্ডবদের অগাধ সম্পদ, অতুল ঐশ্বর্য ও সমগ্র রাজ্য আত্মসাৎ করে তাঁদের সর্বহারা করেও তাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন নি ; পরন্তু দ্বৈতবনে তাঁদের নিষ্করুণ দারিদ্র্যকে নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ও শক্তির দম্ভে উন্মত্ত হয়ে পারিষদবর্গ, সৈন্যসামন্ত ও অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে সেখানে ঘোষযাত্রায় গিয়েছেন। একবার দুর্যোধন তাঁদের জব্দ করতে কোপনস্বভাব ক্ষুধার্ত দুর্বাসামুনিকে সশিষ্য আহারের জন্য পাঠিয়েছেন, আর একবার তিনি তাঁর একমাত্র ভগ্নীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অরক্ষিতা বনবাসিনী দ্রৌপদীহরণে প্রলুব্ধ করেছেন।

কাম্যকবনে পাণ্ডবদের বনবাসের সূচনা থেকে দ্বৈতবনে তার সমাপ্তি পর্যন্ত বার বছরের যাবতীয় ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের নখদর্পণে! কিন্তু দ্বৈতবন থেকে যাত্রা করে অজ্ঞাতবাসের জন্য নিরাপদ গোপনীয় আশ্রয়ের আশায় তাঁরা যে কোথায় গিয়েছেন, অনেক চেষ্টা করেও তিনি সে সব তথ্য

সংগ্রহ করতে পারেন নি। অগণিত দক্ষ ও বিশ্বস্ত গুপ্তচর তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাতে কোনও ফলোদয় হয় নি। যতদূর তিনি জানতে পেরেছেন, কৌরবদের প্রচেষ্টাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দুর্যোধনও পাণ্ডবদের সংবাদ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। কারণ এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শুভাশুভ বিজড়িত রয়েছে। তিনি যদি অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে কোনক্রমে পাণ্ডবদের চিহ্নিত করতে পারতেন, তাহলে পূর্বতন সর্তানুযায়ী আবার তাঁরা বার বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস পালন করতে বাধ্য হতেন। সেইজন্য তিনি প্রচুর ব্যয় করেছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নতুন করে বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন, তাদের গুপ্তচরবিদ্যায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে ছদ্মবেশে দেশে দেশে প্রেরণ করেছেন। বলা বাহুল্য, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের অজ্ঞাত অবস্থান চিরদিন অজ্ঞাতই রয়ে গেছে! কি শত্রুপক্ষ কৌরব, কি মিত্রপক্ষ যাদব,—কারও দ্বারাই আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নি!

নীরব নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কখন যে দ্বারকাপুরীর রাজ-প্রাসাদ থেকে তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি হয়ে গেছে, গভীর চিন্তায় আত্মতন্ময় শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেও পারেন নি। হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙল পাখির কলকাকলি শুনতে পেয়ে। অলিন্দ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের আলো অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের তখনও কয়েক দণ্ড বাকি রয়েছে। তিনি অনুভব করলেন যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঊষাসমাগমেরও খুব বেশি দেরি নেই। পাণ্ডবদের জন্য রাতভোর দুশ্চিন্তায় ও জাগরণজনিত ক্লান্তিতে সে সময় তিনি ভীষণ অবসাদ-গ্রস্ত, কোনও কিছুই তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারছিল না। পাণ্ডবদের কোনও সংবাদ তিনি তখন পর্যন্ত পান নি, অথচ রাত্রি প্রভাতেই তাঁদের অজ্ঞাতবাসের বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর পক্ষকালেরও বেশি অতিবাহিত হবে। গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তনে দৈনন্দিন প্রাকৃতিক নিয়মে দিনের পরে রাতের অন্ধকার নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, আবার রাত্রির অবসানে ধরিত্রী সূর্যকরোজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! কিন্তু পাণ্ডবদের দুঃখরজনীর কি পরিসমাপ্তি

ঘটবে না ? তাঁদের ভাগ্যাকাশে কি কোনও শুভলগ্নে আর নবারুণ উদিত হবে না ? আর কত দিন তাঁদের এই দুর্বিসহ জীবন-যন্ত্রণা উপভোগ করতে হবে ?

অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দেওয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের বিশাল মানচিত্রের উপর। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে গেলেন সেদিকে। মানচিত্রের কোনও রাজ্যই তাঁর সম্পূর্ণ অজানা নয়. সমস্ত রাজ্যই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচিত। তিনি নতুন করে ভাবতে লাগলেন। দ্বৈতবন পরিত্যাগ করে অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবেরা কোন্ রাজ্যকে নিরাপদ মনে করে আত্মগোপন করতে পারেন ? নিকটবর্তী কোথায় আশ্রয় নেওয়া তাঁদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ? দ্বৈতবন থেকে তাঁরা যে অজ্ঞাত-বাসের জন্য রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে যাত্রা করেছেন, সেকথা গুপ্তচরদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই অবগত হয়েছেন। সেইজন্য তার আশপাশের রাজ্যগুলিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তিনি সেগুলির অবস্থান ও আয়তন, ঐশ্বর্য ও সম্পদ, জনবল ও সৈন্যবল, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কৌরবদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। সহসা দ্বৈত-বনের সন্নিকটে অবস্থিত বিশাল মৎস্যরাজ্য তাঁর লক্ষ্য আকর্ষণ করল। মৎস্যাধিপতি বিরাট তাঁর পূর্বপরিচিত। উদারহৃদয় ও সজ্জনব্যক্তি হিসাবে তিনি প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রাজ্যের পরিধি যেমন সুবিস্তৃত, তেমনি প্রাকৃতিক কারণে তা অত্যন্ত সুরক্ষিত। ঐশ্বর্য, সম্পদ, লোকবল, সৈন্যবল প্রভৃতি যে কোনও ক্ষমতাশালী নর-পতির যা একান্ত কাম্য—কোনও কিছুরই বিন্দুমাত্র অভাব নেই তাঁর। কৌরবদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়, বরং যথেষ্ট বিদ্দিষ্ট-ভাবাপন্ন বলা চলে। দুর্যোধনের মিত্ররাজা ত্রিগর্তনৃপতি সুশর্মা, যে এখানকার ঐশ্বর্য ও সম্পদের লোভে প্রলুব্ধ হয়ে বহুবার এই রাজ্য আক্রমণ করেছেন, সে কথাও শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। সমস্ত দিক থেকে বিপদমুক্ত মৎস্যরাজ্যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের স্থান নির্বাচন করা সবচেয়ে নিরাপদের, সে বিষয়ে তাঁর অন্তরে কোনও সন্দেহ রইল না।

গুপ্তচরদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি মৎস্যরাজ্যের যে সব তথ্য অবগত হয়েছেন, এক এক করে সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল। এ বিষয়ে তিনি যতই চিন্তা করতে লাগলেন, ততই তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ়

হয়ে উঠল। নিরাশার মাঝখানে অবার তিনি আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অন্তঃপুররক্ষিকাকে আহ্বান করে বললেন ঃ মহারাণী রুক্মিণীকে খবর দাও ভগ্নী সুভদ্রা যেন এখনই আমার সঙ্গে দেখা করে আর প্রতিহারীকে বল সে যেন অবিলম্বে যাদবপ্রধানদের আমার সঙ্গে মিলিত হবার সংবাদ প্রেরণ করে।

অন্তঃপুররক্ষিকা প্রস্থান করলে শ্রীকৃষ্ণ মাথা তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, নবোদিত রবির হিরণ্যদ্যুতিতে পূর্বাকাশ তখন রাঙা হয়ে উঠেছে!

## ॥ তিন ॥

সারথি দারুকের ক্ষিপ্রগতি অপূর্ব রথ পরিচালনা কৌশলে সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নী সুভদ্রা আর ভাগিনের অভিমন্যুকে নিয়ে মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপনীত হলেন। নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তরে এক অনাস্বাদিত আনন্দ, অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও পরমাশ্চর্য সুখ অনুভব করলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ অভূতপূর্ব পুলকে ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

বর্ষণসিক্ত আষাঢ়ের নির্মেঘ আকাশ! বেশ কিছুক্ষণ আগে প্রবল বর্ষণ হয়ে যাওয়ার ঘনমসীকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ এখন অপসারিত হয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশে উর্মিমালার মত স্তরে স্তরে স্তূপীকৃতভাবে সাজানো শুভ্র মেঘরাজির উপর অস্তায়মান সূর্যের আলোকরশ্মি অপরূপ মায়াজাল রচনা করেছে। সৃষ্টি করেছে মনোমুগ্ধকর নানা রঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ আলপনা। সুবিস্তৃত শষ্যশ্যামল জনপদ, সুগভীর অরণ্য নীর মাথার উপর ও সুউচ্চ প্রাসাদসমূহের শিখর দেশে সেই অপসৃয়মান বিদায়লগ্নের শেষ অস্তরাগে শেষবারের মত আলোকিত হয়ে উঠেছে!

রাজধানীতে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। এর আগেও তিনি বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে একাধিকবার এখানে এসেছেন, কিন্তু কোন সময়েই এ জাতীয় দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে পতিত হয় নি। তিনি দেখতে পেলেন, সমগ্র রাজধানী উৎসবরঞ্জনীর অপূর্ব সাজসজ্জায় সুসজ্জিত। পথে পথে নবনির্মিত নানাবর্ণের বিরাট বিরাট অগণিত তোরণদ্বার বহুবিধ পুষ্পমালা ও পতাকায় সুশোভিত। প্রতিটি তোরণদ্বারের উভয়-

পার্শ্বে স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত বারিপূর্ণ উপর মৃৎকুম্ভের সিন্দূরলিপ্ত আম্রপল্লব ও সশিষ নারিকেল বিরাজিত। সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত অট্টালিকাসমূহে মালাকারে অসংখ্য প্রদীপ দীপ্যমান। গৃহে গৃহে অনাবিল আনন্দের স্বতোৎসরিত ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বালক-বালিকা ও যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নাগরিকেরা নববস্ত্র পরিধান করে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। পুরমহিলারা নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও পট্টবস্ত্রপরিহিতা. তারা থেকে থেকে উলুধ্বনি দিচ্ছে আর শাঁখ বাজাচ্ছে। স্থানে স্থানে বহুলোকের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণেরা মাঙ্গলিক হোম করছেন আর বেদবিদ ব্রাহ্মণেরা উদাত্তকণ্ঠে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তিতপূর্ব চতুর্দিকের এই সব আনন্দবর্ধক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে সুভদ্রা আর অভিমন্যুর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চললেন। বার বার তাঁর মনে হতে লাগল যে হয়তো বা তাঁর অনুমান অমূলক নয়। তা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। বর্তমান ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক তিনি। জীবনে চলার পথে অনেক সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ক্রমবর্ধমান এই সাফল্যই তাঁকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। এবারেও তিনি পাণ্ডবদের অনুসন্ধানে অনুমানকে অবলম্বন করেই সমুদ্র-পর্বত পরিবেষ্টিত সুদূর দ্বারকাপুরী থেকে প্রত্যূষকালে যাত্রা করে মৎস্যরাজ্যে ছুটে এসেছেন। শেষবার দ্বৈতবন পরিত্যাগ করে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের নিকটতম রাজ্য মৎস্য দেশে অজ্ঞাতবাসের জন্য আত্মগোপন করা যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদের—এ কেবল তাঁর অনুমান মাত্র নয়, সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসই তাঁকে এতদূরে টেনে এনেছে। বেশিক্ষণ আগের কথা নয়, আজকে ভোরবেলাতেই কোনও কোনও যাদবপ্রধানের সন্দেহ, দাদা বলরামের বাধা প্রভৃতি তাঁর যুক্তিপ্রবণ চিন্তাধারার উপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি।

প্রতিহারীর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন শুনে বৃষ্ণি, অন্ধক, সাত্বৎ, ক্রোষ্ট, ভোজ, কুকুর প্রভৃতি বংশীয় যাদবপ্রধানেরা অতি প্রত্যূষেই তাঁর প্রাসাদে একে একে এসে উপনীত হলেন।

সে সময় অভিমন্যুকে সঙ্গে করে সুভদ্রাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব সমাগত যাদবপ্রধানদের যথাযথ স্বাগত সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন। পরে তিনি স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে গম্ভীরকণ্ঠে বললেনঃ সমবেত সুধীবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কৌরবদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমাদের নিকট আত্মীয় পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর পুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য-ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজন সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আজ তের বছরেরও বেশি ভাইদের আর দ্রৌপদীকে নিয়ে অসহনীয় দুঃখময় বনবাস জীবনযাপন করেছেন। সম্প্রতি উনিশ দিন হল তাঁদের অজ্ঞাতবাসেরও এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত তাঁদের কোন খবর পাওয়া যায় নি। গুপ্তচরেরা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য অবশ্য তাদের দোষ দেওয়া উচিত হবে না। কৌরবেরা যাতে অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবদের চিনতে পেরে তাঁদের দুর্ভাগ্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে না পারে, তার জন্য প্রথম থেকেই তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন। আপনারা নিশ্চয় জানেন, তাঁদের বনবাসের সর্ত ছিল যে অজ্ঞাতবাসের বছরে যদি তাঁরা ধরা পড়েন তবে তাঁদের আবার নতুন করে বার বছর বনবাস জীবন ও এক বছর অজ্ঞাতবাস জীবনযাপন করতে হবে। কোন রকম বিপত্তি না ঘটে অজ্ঞাতবাসের বছর ভালভাবে অতিক্রান্ত হওয়ায়, একথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এ বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সফল হয়েছেন। আমাদের মতন কৌরবেরাও তাঁদের কোনও সংবাদ সংগ্রহে সমর্থ হন নি। পাণ্ডবেরা এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা যে বর্তমানে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত— সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। আত্মীয় হিসাবে তাঁদের আসন্নবিপদ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত হতে সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ সাময়িক বিরতির জন্য একটু থামলেন। সকলেই তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শুনছেন দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যাদব-প্রধানেরা পরস্পর মৃদু গুঞ্জন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলতে শুরু করবেন, এমন সময় যাদব-প্রধান অক্রূর হঠাৎ বললেনঃ হে বৃষ্ণিকুলসিংহ! আপনি যা বললেন, তা সর্বৈব সত্য। কিন্তু পাণ্ডবেরা এখন কোথায় আছেন, তা জানতে

না পারলে আমরা কিভাবে সাহায্য করব? তাঁদের বর্তমান অবস্থান আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি?

অক্রুরের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হলেন কেশব। তিনি মৃদু হেসে তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ যাদবপ্রধান অক্রূর! আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত। আপনার প্রশ্ন শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমার এখনো সব কথা বলা হয় নি। ধৈর্য ধরে শুনুন, তাহলে আমার বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না।—তারপর একটু থেমে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেনঃ শুনুন, যে কথা বলছিলাম। আপনারা সকলেই জানেন, পাণ্ডবেরা বনবাস জীবনের শেষ ক'দিন দ্বৈতবনে অতিবাহিত করেন। তাঁদের সার্বিক কল্যাণের জন্য পুরোহিত ধৌম্য অগ্নিহোত্র রক্ষা করতে এবং আত্মীয়-স্বজন ও দ্রৌপদীর পরিচারিকাদের নিয়ে মহারাজা দ্রুপদের পাঞ্চালরাজ্যে প্রস্থান করলে আর ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যেরা অশ্ব, হস্তী ও রথাদি নিয়ে দ্বারকাপুরীতে এলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে গভীর রাতে সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতবাসের জন্য আত্মগোপন করেন। দ্বৈতবনের খুব কাছেই সুবৃহৎ মৎস্যরাজ্য অবস্থিত। সেখানকার নৃপতি বিরাটের সঙ্গে কৌরবদের বিন্দুমাত্র সদ্ভাব নেই। দুর্যোধনের মিত্ররাজা ত্রিগর্তের অধিপতি সুশর্মা মৎস্যরাজ্যের ঐশ্বর্য ও সম্পদের লোভে বহুবার ঐ দেশ আক্রমণ করে পরাজিত হয়েছেন। আমি খবর পেয়েছি, প্রায় দেড় মাস আগে সৈরিন্ধ্রী নামে মহারাণী সুদেষ্ণার এক পরিচারিকাকে প্রকাশ্য রাজসভায় মহারাজা বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি মহাবল কীচক অশালীন আচরণ করলে ঐ পরিচারিকার পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীর একজন তাঁকে আর তাঁর একশ পাঁচজন ভাইকে হত্যা করে। কীচক ও তাঁর ভাইদের মৃত্যুতে মৎস্যরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছে মনে করে কিছুদিন আগে সুশর্মা আর দুর্যোধন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দু'দিক থেকে ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে প্রথমে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অগ্নিকোণ দিয়ে সসৈন্যে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করেন। মহারাজা বিরাট সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না, পরন্তু নিজে পরাজিত ও বন্দী হলেন। শুনেছি, সেই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ঐ পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীই একজন গন্ধর্ব স্বামী সুশর্মাকে সসৈন্য পরাজিত করে বিরাটকে মুক্ত করেন। ওদিকে পূর্বেকার কথামত ঠিক এর

পরের দিন কৃষ্ণাষ্টমীরঅন্তে কুরুরাজ দুর্যোধন ঐ রাজ্য উত্তরদিক থেকে আক্রমণ করে উত্তর গোগৃহের ষাট হাজার গোধন অপহরণ করেন। পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শাস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাবল অশ্বত্থামা, মহাবীর কর্ণ, কূটনীতিবিদ শকুনি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বীর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মহারাজা বিরাট সে সময় ত্রিগর্তরাজের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। রাজধানী সম্পূর্ণ অরক্ষিত একমাত্র রাজকুমার উত্তর ব্যতীত কোনও বীরই তখন রাজপুরীতে ছিলেন না। কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে অনেক অনুসন্ধান করেও তিনি মনের মতন একজন উপযুক্ত সারথিও খুঁজে পেলেন না। শেষে ঐ পরিচারিকারই কথায় আস্থাস্থাপন করে রাজকুমারী উত্তরার নৃত্য-সঙ্গীতশিক্ষক বৃহন্নলাকে সারথি করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। আমি আরও খবর পেয়েছি যে নিজে যুদ্ধ করে নয়, দৈবযোগে এক দেবপুত্রের আনুকূল্যে সমবেত কুরুবীরেরা পরাজয় বরণ করলে তিনি অপহৃত গোধন মুক্ত করেন। আপনারা সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন, সেই দুর্ধর্ষ কৌরব মহারথীদের একক-যুদ্ধে পরাভূত করা এক মাত্র তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ভিন্ন যে কোনও দেবতারও সাধ্যাতীত। আমি আরো জানতে পেরেছি, ঐ পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী ব্যতীত অক্ষবিদ কঙ্ক, সূপকার বল্লব, নৃত্যসঙ্গীত শিক্ষক বৃহন্নলা, অশ্বপালক গ্রন্থিক ও গো-পালক তন্ত্রিপাল ঠিক এক বছর আগে একই সময়ে রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। তার উপর পরিচারিকার পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীর প্রবাদও বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে। আমার মনে হয়, পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী আর কেউ নন, স্বয়ং পট্টমহারাণী দ্রৌপদী আর তাঁর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীই পঞ্চ পাণ্ডব এবং কঙ্ক, বল্লভ, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক ও তন্দ্রিপাল যথাক্রমে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন, সখা পার্থ আর মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব। কৌরবদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের অভীপ্সায় তাঁরা এইভাবে পাঞ্চালরাজ্যে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে এক বছর অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করেছেন। যদি আমার এই অনুমান সত্যি হয় তাহলে, কীচক আর তাঁর একশ পাঁচজন শক্তিশালী ভাইদের হত্যা করেছেন ও ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে সসৈন্য পরাজিত করে মৎস্যরাজকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন প্রবল পরাক্রান্ত অসীম শক্তিধর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এবং উত্তর গোগৃহে সমবেত কুরুবীরদের সসৈন্যে

পরাভূত করে অপহৃত গোধন মুক্ত করেছেন গাণ্ডীবধন্যা শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ ধনঞ্জয়।

অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর বক্তৃতার শেষদিকে একদিকে যেমন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রকাশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি কণ্ঠস্বর ক্রমশ গাঢ়সংবদ্ধ ও উদাত্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সমবেত যাদবপ্রধানেরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। কেউ আর কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁরা কেবল পারস্পরিক চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় সকলে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে কেউই আগে লক্ষ্য করতে পারেন নি ইতিমধ্যে কখন সেখানে তাঁর অগ্রজ বলরাম এসে উপনীত হয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি সবাই টের পেলেন তাঁর আকস্মিক উক্তিতে। অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত জড়িতকণ্ঠে ঢুলুঢুলু নেত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথার প্রতিবাদ করে বললেনঃ তুমি ঠিক বলছ না শ্রীকৃষ্ণ! এতক্ষণ তুমি যা বললে, তা তোমার অনুমান মাত্র। তাকে তোমার স্বকপোলকল্পিত কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না। অনুমান হল নিছক অনুমানই সত্যিকারের কোনও ভিত্তিই তার নেই। কোনও অনুমানকেই জোর করে সত্যি বলে চালানো যায় না আর তা করতে চাওয়াও এক ধরণের বোকামি। তুমি এত বুদ্ধিমান হয়েও একথা কি করে বলছ, তা আমার বুদ্ধিরও অগম্য। তুমি ভেবেচিন্তে কথা বল। নইলে কেউ তোমাকে অন্যরকম মনে করলে আমার তা ভাল লাগে না।

বলরাম নেশাখোর সাদাসিদে মানুষ। রাজনীতির কূটনৈতিক ঘোরপ্যাঁচ তাঁর মাথায় ঢোকে না। কোনও কথা চিন্তা করে বলা চিরদিন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ আর সে কথারও কোনও আঁকডাক নেই। তাঁর মুখে যা আসে, তাই তিনি সবার সামনে নির্দ্বিধায় বলে যান। এর জন্য বহুবার তাঁকে অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আজো তিনি ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন নি, একটা কিছু বলতে হবে বলেই বলেছেন। ঊষাকালে প্রতিহারী যখন তাঁর প্রাসাদে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাড়াতাড়ি সাক্ষাতের আহ্বান জানায়, তখন তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। বাসুদেবের আহ্বানে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর প্রিয়তমা মহিষী রেবতী তাঁকে ঘুম থেকে তুলে এই সংবাদ দেন। ভাই ডেকেছেন শুনে

তিনি এতটুকু দেরি না করে একরকম ঘুমচোখে ঢলতে ঢলতে চলে এসেছেন।

বলরামের অসলগ্ন উক্তিতে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণকে বেশ বেগ পেতে হয়। কি করে সব দিক সামাল দিয়ে অবস্থা আবার আয়ত্বে আনবেন, তাঁর জন্য তাঁর চিন্তার অবধি থাকে না। এবারেও সেই একই ঘটনা পুনরাবৃত হল। অগ্রজের কাছ থেকে আপন বক্তব্যে এভাবে বাধা পেয়ে তিনি বিশেষ বিব্রতবোধ করলেন। তাৎক্ষণিক সংকট কাটিয়ে কেমন করে তিনি সকলের সামনে বক্তব্যকে পুনরায় উপস্থাপিত করবেন, তা ভাবতে লাগলেন। তাঁকে এই দুরূহ চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিলেন সত্যকপুত্র সাত্যকি। অর্বাচীনের মতন বলরামের অযৌক্তিক কথায় রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমার স্বভাবের অনুরূপ কথাই তুমি বলেছ। দিনরাতে নেশা করতে করতে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। তুমি কি চিন্তা করে একটা কথাও বলতে পার না। পাগলের মতন কি আজেবাজে বকছ? বৃষ্ণিকুলপ্রধান কেশব ঠিক কথাই বলেছে। তার সমস্ত কথাই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, কোনও কথা অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সাত্যকির ধমকে কাজ হল। অনেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন। পরিস্থিতি দেখে সম্যক বুঝতে না পেরে বলরাম একেবারে চুপ করে গেলেন। আপনা থেকে অবস্থা অনুকূলে আসায় এবং ক্রমশঃ তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় শ্রীকৃষ্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি দেখলেন যে অধিকাংশ যাদবপ্রধান তাঁর কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তিনি তখন পূর্বসূত্র ধরে বলতে লাগলেন ঃ আমি বোধ হয় আপনাদের সব কথা ভালভাবে বোঝাতে পারি নি। আমার সেই অক্ষমতার জন্যই দাদা বলরাম ভুল বুঝেছেন। আমি আপনাদের আবার বলছি। আমার মনে হয়— মনে হয় বলি কেন—দৃঢ় বিশ্বাস পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে মৎস্যরাজ্যে আত্মগোপন করে আছেন। আমি ঠিক করেছি একটু পরে ভগ্নী সুভদ্রা আর ভাগিনেয় অভিমন্যুকে নিয়ে সেখানে যাত্রা করব। মৎস্যরাজ বিরাটও আমার পূর্ব পরিচিত। সুভদ্রাকে একথা আগেই জানিয়েছি। সে পুত্রকে নিয়ে এখানেই উপস্থিত রয়েছে। পাণ্ডবেরা কেবল আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়ই নন; তাঁরা ধর্মপ্রাণ, উদারচেতা ও বীর। তাঁদের আসন্ন বিপদে সর্বভাবে সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যে কোনও অবস্থার জন্য আপনারা সব সময় প্রস্তুত থাকবেন। এখন সকলের অনুমতি পেলেই আমি যাত্রার আয়োজন করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত কথাগুলি বলে সম্মতির জন্য সকলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এতাদৃশ বিনয়ে সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন, 'সাধু সাধু' বলে তাঁকে স্বাগত জানালেন। একবাক্যে সকলের সমর্থন লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। দ্বিধান্বিত চিত্তে বলরাম আমতা আমতা করে বললেনঃ কেশব! তুমি তো কারো কোনও কথাই শুনবে না। চিরটা কাল একগুঁয়েমি করেই কাটালে। নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। তোমাকে কিছু বলাই বৃথা। কিন্তু তোমার এভাবে সুভদ্রা আর অভিমন্যুকে নিয়ে একাকী অতটা দূরদেশে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। পথে কত রকম বিপদ ঘটতে পারে। তাই আমার মনে হয়—

বলরামের কথা শেষ হতে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ। মাঝখানে বাধা দিয়ে সম্মোহনী মৃদু হেসে তিনি বললেনঃ আপনি ভাববেন না দাদা! অকারণ ভেবে কোনও লাভ নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমাদের কোনও বিপদ হবে না। আর বিপদ যদি আসে, আমি তা একাই সামলাতে পারব। ভাগিনেয় অভিমন্যু রয়েছে, বীর্যবত্তায় সেও কম যায় না। একমাত্র সখা অর্জুন ভিন্ন তার সমকক্ষ যোদ্ধা বর্তমান ভারতবর্ষে কেউ নেই। আর ভগ্নী সুভদ্রা! তার বীরাঙ্গনা চরিত্রের পরিচয় তো কারো অজ্ঞাত নয়। আপনি নিশ্চয় সেদিনের কথা আজও ভুলে যান নি, তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয় স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে দ্বারকাপুরীতে এলে সে এবং সুভদ্রা একে অপরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। পার্থ যখন তাকে বিবাহের জন্য রৈবতকপর্বত থেকে অপহরণ করে হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করে তখন সমবেত যাদবেরা তাদের বাধা দিয়েছিল। সে সময় সুভদ্রা অবিচলিত হৃদয়ে যাদব বীরদের বিরুদ্ধে ভাবী স্বামীর একক যুদ্ধে রণক্ষেত্রে তার রথ পরিচালনায় অত্যন্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছিল।—দাদা! আপনি আর আপত্তি করবেন না। কোনও কারণেই আমি রওনা দিতে দেরি করতে চাই নে।

রাজধানীর পথ পরিক্রমণ করতে করতে একে একে সমস্ত কথাই মনে

পড়ল শ্রীকৃষ্ণের। যাদবপ্রধানদের সম্মতি থাকলেও দাদা বলরামের নিষেধ এক রকম অগ্রাহ্য করেই তিনি আশার বশবর্তী হয়ে কেবলমাত্র দারুককে সারথি করে সুভদ্রা আর অভিমন্যুকে নিয়ে সুদূর মৎস্যরাজ্যে এসেছেন। তিনি রাজপ্রাসাদের যত নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তাঁর উৎকণ্ঠা তত বাড়তে লাগল। তাঁর মানসিক অবস্থা সে সময় চরমে উঠেছে। সেখানে পেঁছে কি ঘটবে, তা ভেবে তিনি ক্রমশ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। আশা-নিরাশার দোলায় তখন তিনি দোদুল্যমান—কি হয় কি হয় ভাব। অথচ তখনকার দোলাচল মনের সে অস্থিরতার কথা কাউকে তিনি বলতে পারছিলেন না।

ধীরে ধীরে সমগ্র রাজধানীতে রাত্রি নেমে এল! পূর্ণিমার চাঁদের কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! আরো কিছুদূর অগ্রসর হলে রাজপ্রাসাদ সকলের দৃষ্টিগোচর হল। সেখানে যেন নিরন্তর আলোর বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। সমগ্র রাজপুরী সুচারুরূপে সুসজ্জিত। অগণিত দীপালোকে ও বড় বড় মশালের আলোয় সর্বত্র আলোকিত। তার উপর পূর্ণচন্দ্রের অপরূপ স্নিগ্ধ দ্যুতি আলোকের ঘনত্বকে আরো সম্প্রসারিত করেছে। সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলল ঃ যাদবপ্রধান! আমরা প্রায় পেঁছে গেছি। এখন আপনার আগমন সংবাদ জানানো প্রয়োজন।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না দারুক! আমি তার ব্যবস্থা করছি।—অন্তরের তাৎক্ষণিক ব্যাকুলতা প্রকাশ না করে শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন। তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বের করে জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। সুভদ্রা তাঁকে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কোন কথারই বলার অবকাশ পেলেন না। কি ঘটতে চলেছে, দাদা শ্রীকৃষ্ণ কি করতে চাইছেন ; তা বুঝতে না পেরে তিনি চুপ করে রইলেন। অভিমন্যু নিষ্পলক নেত্রে মাতুলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। পাঞ্চজন্যের শেষ আওয়াজ বাতাসে প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে ভীমসেন, অর্জুন ও উত্তরকে রথের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। এইভাবে মধ্যম ও তৃতীয় পাণ্ডবকে হঠাৎ দেখে সুভদ্রা আর অভিমন্যুর বিস্ময়ের অবধি রইল না। নিজের অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ণ যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তাঁর সারাদিনের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল।

তাড়াতাড়ি তিনি রথ থেকে অবতরণ করে প্রাসাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। মাঝপথে পরস্পর মিলিত হলে তিনি প্রথমে ভীমসেন ও অর্জুনকে, পরে রাজকুমার উত্তরকে স্বাগত জানিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

ভীমসেন অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ ভাই শ্রীকৃষ্ণ ! দীর্ঘ তের বছর বনবাস আর অজ্ঞাতবাসের অশেষ দুঃখভোগের শেষে আজই প্রাতঃকালে বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে উত্তরাঢ়া নক্ষত্রে ইন্দ্রযোগে মৎস্যরাজ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ধর্মরাজের আদেশে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী সহদেব আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি এই দিনটি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময় বলে গণনা করে স্থির করেছিল। কিন্তু আত্মপ্রকাশের দিনেই যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তা একবারও ভাবি নি। তাই তোমায় দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বুঝিয়ে বলতে পারছি না !

অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ সখা মাধব ! তোমার পাঞ্চজন্যের আওয়াজ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মৎস্যরাজ বিরাট, পাণ্ডব-কুললক্ষ্মী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে কারো বিন্দুমাত্র দেরি সইছে না। রাজসভায় উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই তোমার প্রতীক্ষা করছেন। ধর্মরাজ তোমাকে সানন্দে সেখানে নিয়ে যেতে আমাদের পাঠালেন। মহারাজ বিরাটের নির্দেশে রাজকুমার উত্তরও আমাদের সাথে এসেছেন।—এই বলে তিনি উত্তরকে দেখালেন।

রাজকুমার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত স্বাগত জানিয়ে অর্জুনের কথা সমর্থন করে বললেন ঃ হে বৃষ্ণিকুলতিলক ! তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যথার্থই বলেছেন। আমার পিতা মৎস্যাধিপতি বিরাট, জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সকলেই আপনাকে দেখার জন্য সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। আপনি আর বিলম্ব করবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ কপট গাম্ভীর্যে অর্জুনের প্রতি লক্ষ করে বললেন ঃ কিন্তু সখা ! আমি তো এখন যেতে পারছি না। আমি একা আসি নি। রথে ভগ্নী সুভদ্রা আর ভাগিনেয় অভিমন্যু রয়েছে। তাদের কোথায় রেখে যাই বল ?

অর্জুন বিস্মিত হলেন শ্রীকৃষ্ণের কথায় ! প্রাণপ্রতিম প্রিয়া সখ্যকে

দেখে তাঁর অন্তরে যে আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল, প্রিয়তমা ভার্যা সুভদ্রা ও প্রিয়তম পুত্র অভিমন্যু এত কাছে এসেছে জানতে পেরে তা শতগুণে বর্ধিত হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে রথের দিকে ছুটে গেলেন।

উত্তর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন: আপনি সবাইকে নিয়েই চলুন! আমি মৎস্যরাজের হয়ে তাঁদেরও স্বাগত আহ্বান জানাচ্ছি।

অর্জুন প্রথমে সুভদ্রার ও পরে অভিমন্যুর হাত ধরে রথ থেকে নামালেন। সুভদ্রা আর অভিমন্যুর বিস্ময় তখনো অপসৃত হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণ দূরে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন!

## ॥ চার ॥

রাজসভা থেকে প্রত্যাবর্তন করে একটি সুপ্রশস্ত কক্ষমধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে উপবেশন করলেন। অনেকদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এতখানি কাছে পেয়ে তাঁদের আনন্দের আর সীমা নেই। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের ভাগ্যাকাশে আজও সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয় নি। নিশ্ছিদ্র তিমিরাবৃত মেঘরাশি অপসৃত হয়ে কবে যে ভাগ্যরবির প্রকাশ ঘটবে, তাও সম্পূর্ণ অজানা। ভবিষ্যৎ অগ্নিপরীক্ষার নিষ্করুণ দিনগুলি ক্রমশ এক এক করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কৌরবেরা যে সহজে পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করবেন না, সে বিষয়ে আজ আর কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পাণ্ডবেরা এখন অসহায়, নিঃসম্বল ও কপর্দকশূন্য এবং সর্বতোভাবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত। একদা ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের সাফল্যকালে ভারতবর্ষের যে সমস্ত নৃপতি তাঁদের খুব কাছাকাছি ছিলেন, সুদীর্ঘ তের বছরের ব্যবধানে বর্তমানে তাঁরা বহুদূরে সরে গেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে এ ঘটনা অত্যন্ত অশোভন লাগলেও একে অযৌক্তিক বলে পরিহার করা যায় না। পাণ্ডবেরা তা ভাল করেই জানেন। নতুন করে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করা একদিকে যেমন বহু সময় সাপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার অনেকেই হয়তো বা এখন সর্বশক্তিমান কৌরবদের বিরুদ্ধে হৃতসর্বস্ব পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান

করতে ইতস্তত করবেন। কারণ কেবলমাত্র হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দুটি-ই নয়, ইন্দ্রপ্রস্থের যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সম্পদই আজ কৌরবদের অধিকারে। উপরন্তু ভারতবর্ষের অনেক শক্তিশালী নরপতিই তাঁদের মিত্রশক্তির অন্তর্গত। সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদী সম্মিলিত এই শক্তিসংঘকে কেউই স্বেচ্ছায় ঘাটাতে চাইবেন না, আত্মরক্ষার তাগিদে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন করবেন। অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর থেকে সাংসারিকজীবনে পাণ্ডবদের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও তাঁদের সেই সংগ্রামী মনোবল আজও বিনষ্ট হয় নি। শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক উপস্থিতি তাঁদের সহজাত মনোবলকে দ্বিগুণিত করল।

শ্রীকৃষ্ণের উপর চিরদিন পাণ্ডবদের আস্থা ও বিশ্বাস অপরিসীম। তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী চিন্তাবিদ। অতীতে বহু বিপদসংকুল সঙ্কটময় মুহূর্ত পাণ্ডবেরা তাঁর সুগভীর চিন্তাশীলতা ও সুপরিকল্পিত কার্যধারা অনুসরণ করে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। বর্তমানেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও ঐকান্তিক সহায়তা তাঁদের কাছে একান্ত অপরিহার্য। সেইজন্য অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হতে না হতেই তাঁরা মনে মনে তাঁর অভাব অনুভব করছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এইভাবে তাঁর উপস্থিতি তাঁদের কৌতূহলকেও কম উদ্রিক্ত করে নি। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌতূহলকে আর দমন করতে না পেরে বললেন ঃ শ্রীকৃষ্ণ! ক'দিন ধরে কেবলই তোমার কথা মনে হচ্ছিল। আজ তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, তা আমার কল্পনারও অগোচর ছিল। তাই হঠাৎ তোমার পাঞ্চজন্যের আওয়াজ আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নি যে তুমি এসেছ। শেষে ভীম আর অর্জুনের কথায় সে ভ্রান্তি দূর হল। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে এখানে কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে আমরা মৎস্যরাজ্যে রয়েছি, তা তুমি জানলে কি করে? আমরা বিগত এক বছরের উপর যেভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছি, তাতে তো এ সংবাদ কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়?

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে স্বভাবসুলভ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, তারপর তাঁদের কৌতূহলকে আরও বাড়িয়ে তুলতে বললেন ঃ দাদা! আপনারা যে সর্বপ্রকারে গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন এবং তাতে

যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার বা দুর্যোধনের অগণিত গুপ্তচরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও অজ্ঞাতবাসের কোনও সংবাদ অবগত হতে পারে নি। তাদের অকৃতকার্যতাই আপনাদের গোপনীয়তা রক্ষার নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বছর শেষ হয়ে গেলে কোনও খবর না পেয়ে আমিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কি যে করব, ঠিক করে উঠতে পারি নি। কাল রাতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌরবদের মিত্রতা ও মনোমালিন্য, দ্বৈতবনের নিকটতম রাজ্যগুলির অবস্থান, কোন দেশ অজ্ঞাতবাসের সময় সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করতে করতে অকস্মাৎ সুবিস্তৃত মৎস্যরাজ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখনো কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি যে আপনারা এখানেই রয়েছেন।

সাময়িক বিরতির জন্য বাসুদেব একটু থামলেন। পাণ্ডবদের কৌতূহলকে আরও বর্ধিত করাই ছিল তাঁর এই বিরতির উদ্দেশ্য। গম্ভীর যুধিষ্ঠির মনোযোগের সঙ্গে এতক্ষণ তাঁর কথা শুনছিলেন, চুপ করতেই তিনি আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করলেন ঃ কি করে তুমি ঠিক করলে যে আমরা এখানে বসবাস করছি ?

শ্রীকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন ঃ অঙ্ক কষে আর নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে। দুই আর দুইয়ের যোগফল যে চার—এটা যেমন সত্যি, চারকে ভাঙলে তেমনি পাওয়া যায় দুইয়ের গুণিতক দুই—সেটাও সত্যি। চিন্তা করতে করতে অঙ্ক আর অনুমান যখন মিলে গেল, তখনি বুঝতে পেরেছি আপনারা এখানে বাস করছেন। মৎস্যাধিপতি বিরাটের সঙ্গে কৌরবদের অসদ্ভাবের কথা আমার অজানা নয়। কৌরবেরা লোভী আর স্বার্থপর। এই রাজ্যের অগাধ ঐশ্বর্য, অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল সংখ্যক গোধন দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের তৃতীয় রিপুর পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেনাপতি মহাবল কীচকের জীবদ্দশায় তাঁরা এদিকে অগ্রসর হতে সাহসী হন নি। বছরের পর বছর মনের ইচ্ছে তাঁদের মনেই চেপে রাখতে হয়েছিল। দুর্যোধনের মিত্ররাজা ত্রিগর্তনৃপতি সুশর্মা তো বহুবার আক্রমণ করে পরাজয় বরণ করেছেন। কিন্তু কীচক আর তাঁর ভাইদের হত্যার পর মৎস্যদেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে অনুমান করে দুর্যোধন আর সুশর্মা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী

দুদিক থেকে এই রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে সুশর্মা সসৈন্যে অগ্নিকোণ দিয়ে অভিযান করলে সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে মহারাজা বিরাট বাধা দিতে এসে পরাজিত ও বন্দী হন। পরের দিন কৃষ্ণাষ্টমীর অন্তে দুর্যোধন সমস্ত কৌরববাহিনী নিয়ে উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করে ষাট হাজার গোধন অপহরণ করেন। রাজধানীতে সে সময় রাজকুমার উত্তর ব্যতীত একজন সৈনিকও উপস্থিত ছিল না। এক রকম বাধ্য হয়েই রাজকুমার ভগ্নী উত্তরার নৃত্যসঙ্গীতশিক্ষক বৃহন্নলাকে সারথি করে কৌরবদের বিরুদ্ধে একাকী রণক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সকৌতুকে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন। তাঁর কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সপ্রতিভ হয়ে অর্জুন মস্তক অবনত করলেন। সকলে অত্যন্ত মনোনিবেশের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ থামতেই ভীম অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন ঃ তুমি থামলে কেন শ্রীকৃষ্ণ ? এখনও তুমি ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তর দাও নি ? চুপ করে থেকো না। তোমার কথা শুনতে ভাল লাগছে। তারপর ?

মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন ঃ মধ্যম পাণ্ডব ! আমার উক্তিতে আপনাদের অন্তরে আগ্রহ সঞ্চারিত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনারা যে আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন, এ তারই ফলশ্রুতি। নইলে এমন কোনও গুণ আমার নেই যা আপনাদের প্রীতি উৎপাদন করতে পারে। তারপর তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ শুনুন ধর্মরাজ ! সকলের কাছ থেকে এর পর যা শুনেছি, তার একবর্ণও বিশ্বাস করতে পারি নি। রাজপ্রসাদের পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীর একজন গন্ধর্ব স্বামীর যুদ্ধে সসৈন্যে ত্রিগর্তরাজের পরাজয়ে মৎস্যরাজের মুক্তি এবং নাম-না-জানা জনৈক দেবপুত্রের কৃপায় রাজকুমার উত্তরের সমবেত কৌরববাহিনী বিজয়—যে বাহিনীতে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি সর্বলোকত্রাস মহাবল রথী মহারথীরা ছিলেন। এই সংবাদ আমাকে স্তম্ভিত করেছে ধর্মরাজ, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে নি। এর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা, তখনই তা ধরতে না পারলেও সব সময়েই আমার মনে হয়েছে, এই সংবাদ প্রচারের পেছনে একটা নিগূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে। কিন্তু কি সে কারণ ? এই চিন্তা আমাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। দিনরাত ভেবে কোনও কূলকিনারা পেলাম না।

হঠাৎ পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীর জনশ্রুতিই প্রথম আমার মনকে নাড়া দেয়। খবর নিলাম, এক বছর আগে সে রাজপ্রাসাদে অন্তঃপুরিকাদের কেশ পরিচর্যায় নিযুক্তা হয়। ঠিক একই সময়ে অক্ষবিদ কঙ্ক, সূপকার বল্লভ, নৃত্যগীতশিক্ষক বৃহন্নলা, অশ্বপলক গ্রন্থিক ও গোপালক তন্ত্রিপাল নিযুক্ত হয়েছিল। পরিচারিকার কথায় রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে তাঁর রথের সারথি করেন আর তারই সারথ্যে তিনি একাকী কৌরবদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সঙ্গে না থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ঘটনার সাক্ষী দেবার মতন একজন লোকও নেই। সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে মনে হল, সমবেত কৌরববাহিনীকে পর্যুদস্ত করে উত্তরের বিজয়ী হওয়া যেমন ছেলেভুলোনো গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি জনৈক দেবপুত্রের কৃপায় জয়লাভ করাও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে সত্য ঘটনা কি? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর যে দিতে পারে, সেই বৃহন্নলাই বা কে? তার সঠিক পরিচয়ই বা কি? কৌরব মহারথীদের এককযুদ্ধে পরাভূত করা তো অর্জুন ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়? অর্জুনের কথা মনে আসতেই খেয়াল হল, তবে কি বৃহন্নলাই অর্জুন? ত্রিলোকবন্দিতা উর্বশীর অভিশাপে অজ্ঞাতবাসকালে সেই বৃহন্নলারূপে আত্মগোপন করেছে? সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ় প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হল। বৃহন্নলাকে অর্জুন বলে অনুমান করার সঙ্গেসঙ্গেই সমস্ত জলের মতন পরিস্কার হয়ে গেল। তখন বুঝতে আর কোনও বাধা রইল না, পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীই পট্টমহারাণী দ্রৌপদী আর তাঁর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীই পঞ্চ পাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরাই ছদ্মবেশ ধারণ করে কঙ্ক, বল্লব, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক ও তন্দ্রিপাল নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়েছেন। মনে হল, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ অর্জুনই উত্তর কথিত জনৈক দেবপুত্র এবং মধ্যম পাণ্ডব মহাশক্তিধর বৃকোদরই কীচক ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গহন্তা আর তাঁরই পরাক্রমে সসৈন্যে পরাভূত হয়েছেন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি সুভদ্রা আর অভিমন্যুকে নিয়ে সুদূর দ্বারকাপুরী থেকে মৎস্যরাজ্য ছুটে এসেছি। আমার বিশ্বাস যে আলেয়ার অলিক কল্পনাবিলাস নয়, আপনাদের এখানে উপস্থিতি তার স্বাক্ষর বহন করছে।

পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ সংবাদ পর্যালোচনায় যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। এইভাবে সংবাদ বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়া যে কতদূর চিন্তা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক তা ভাবতেই তাঁদের তাঁর উপর আস্থা ও নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেল। তাঁরা জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের অন্যতম চিন্তানায়ক, শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ এবং অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। কিন্তু এর ব্যাপ্তি যে কতখানি হতে পারে, তার সম্বন্ধে তাঁদের কোনও সত্যিকারের ধারণা ছিল না। পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, মগধে জরাসন্ধ বধে ও বন্দী রাজন্যবর্গের মুক্তিতে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রপ্রস্থের শক্তিবৃদ্ধিতে এবং রাজসূয় যজ্ঞে চেদিপতি শিশুপাল হত্যায় তাঁর চিন্তাশীলতা, কূটনীতিজ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কিছু কিছু প্রকাশ দেখা গেলেও বর্তমান পর্যালোচনার সঙ্গে সেই সব ঘটনার তুলনাই করা যায় না। সকলেই তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির অন্তরের অপরিসীম আবেগে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন: ভাই জনার্দন! কি বলে তোমার প্রশংসা করব জানি না। কিন্তু তোমার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এভাবে যে কেউ চিন্তা করতে পারে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ, শেষবার দ্বৈতবন পরিত্যাগ করে আমরা এই রাজ্যেই আত্মগোপন করে রয়েছি। কঙ্ক, বল্লব, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক ও তন্ত্রিপালের ছদ্মবেশে আমরা সকলের কাছে পরিচিত হলেও আমাদের প্রত্যেকেরই আরো একটি করে গুপ্ত নাম ছিল। অপরের অজ্ঞাত এই নামগুলি হল—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন আর জয়দ্বল। সবার অলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি আর বিশেষ সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যই কেবলমাত্র এগুলি ব্যবহার করা হত। কেশব! তুমি তো জান, অজ্ঞাতবাসের পূর্বে আমরা পুরোহিত ধৌম্যের মন্ত্রোচ্চারিত আহুতিদত্ত অগ্নিহোত্র এবং সমবেত মুনিঋষিদের প্রদক্ষিণ করি। তারপর সেই অগ্নিহোত্র রক্ষার জন্য ধৌম্য দ্রৌপদীর দাসীদের সঙ্গে পাঞ্চালরাজ্যে প্রস্থান করলে এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যেরা অশ্ব ও রথাদি নিয়ে আমার আদেশে তোমাদের দ্বারকাপুরীতে যাত্রা করলে আমরা দ্বৈতবন পরিত্যাগ করেছি। বনবাসের সময় সবাই কাছে থাকত, অনেকের সংস্পর্শে এসেছি, বহু মুনিঋষির আশীর্বাদ ও উপদেশ

পেয়েছি ; তাই প্রাত্যহিক জীবনে যথেষ্ট অভাব অভিযোগ থাকলেও দুঃখ-সুখ মিশ্রিত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক রকম বছরগুলি অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু সকলের থেকে দূরে থাকায় অজ্ঞাতবাসের এক বছর অত্যন্ত বিষাদে কেটেছে। মনের কথা মনেই রয়ে গেছে. প্রাণখুলে কাউকে বলতে পারি নি। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে সেই সব না বলা কত কথাই না বার বার মনে পড়ছে।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কোনও ঘটনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা যে মৎস্যরাজ্যে বসবাস করছেন, তা তাঁর অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেইজন্য তাঁর অন্তরে এখানকার সমস্ত কাহিনী জানার প্রবল অভীপ্সা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মুখে সে কথা তখনি বলতে তিনি সঙ্কোচবোধ করছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি তাঁর সেই অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠল। তিনি আগ্রহ সহকারে বললেন ঃ দাদা! আপনি থামবেন না। আপনার কথায় আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এখানে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে, আমি তার কিছুই জানি না। আপনারা সবাই মিলে অজ্ঞাতবাসের এই এক বছরের সমস্ত কাহিনী আমাকে বলুন। মনের ইচ্ছাকে আমি আর দমন করতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় উৎসাহিত হয়ে পাণ্ডবেরা তাঁকে অজ্ঞাতবাসের কাহিনীগুলি একে একে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। পাণ্ডবদের বিষাদ-বিদুর জীবনযন্ত্রণা ও কীচকের হাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা একদিকে যেমন তাঁর চিত্তকে বেদনার্ত করে তুলল, অন্যদিকে তেমনি অজ্ঞাতবাসের অন্তিমপর্বে ভীমসেন ও অর্জুনের অসাধারণ বীরত্বে—বিশেষ করে অর্জুনের এককযুদ্ধে সমবেত কৌরববাহিনী পরাজয়ে তাঁর হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, ধর্মরাজ! এটা খুব ভাল হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের শেষলগ্নে এইভাবে কৌরবদের সঙ্গে তৃতীয় পাণ্ডবের অসম সংঘর্ষের ফলে একটা নতুন দিক উম্ঘাটিত হল। উত্তর গোগৃহে প্রিয়সখা অর্জুনের একাকী সংগ্রামে বিশাল কৌরববাহিনীকে পরাভূত করা ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক স্থিতি-শীলতাকে ভাবিয়ে তুলবে। ক্ষাত্রশক্তি ও বীর্যবত্তায় অর্জুন যে সমগ্র কৌরব মহারথীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ঘোষযাত্রার পরে তা আর একবার সর্বজনসমক্ষে নতুন করে প্রমাণিত হল। কৌরব ও পাণ্ডবদের

ভবিষ্যৎ বৃহত্তম দ্বন্দ্ব আসন্ন। পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আপনাদের এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবেরা নিশ্চয় আপনাদের হৃতরাজ্য সহজে প্রত্যর্পণ করতে চাইবেন না, পরন্তু ফিরিয়ে না দেবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করার উদ্যোগ করবেন। সেই প্রচণ্ড সংগ্রামে কোনও দেশই নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে দূরে সরে থাকতে পারবে না, কোনো-না-কোনো পক্ষ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উত্তর গোগৃহে কৌরবদের এই মর্মান্তিক পরাজয় বৃত্তান্ত রাজন্যবর্গের চিন্তার প্রভূত কারণ হয়ে উটবে।

শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনের বিশেষ করে অর্জুনের অসাধারণ শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করলেও নতুন করে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে পাণ্ডবেরা বেশি আনন্দিত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উৎসাহের সঙ্গে বললেন: বাসুদেব! তোমাকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেওয়া হয় নি। ঘটনাটি এত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে আজ সকালে ঘটে যে এখনো ভেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি। কি করে নিজেদের মর্যাদা বজায় রেখে সব দিক রক্ষা করব জানি না। তোমার বুদ্ধিবিবেচনার উপরে আমরা চিরদিন নির্ভর করে এসেছি। তাই তোমাকে বলার জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সুদীর্ঘ পথশ্রমে আজ তুমি খুবই ক্লান্ত, কিন্তু তোমাকে না জানিয়ে এক তিল স্বস্তি পাচ্ছি না।

যুধিষ্ঠিরের কথা শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত কৌতূহলী করে তুলল। কিন্তু তিনি অন্তরের কৌতূহলকে মুখে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে স্বভাবসিদ্ধ বিনীত ভঙ্গিতে বললেন: দাদা! এতটা পথ আসার ফলে আমি খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বটে, কিন্তু আপনাদের সবাইকে সুস্থ ও সবল দেখার সঙ্গেসঙ্গেই আমার সেই ক্লান্তি দূর হয়েছে। অনেকদিন বাদে সকলে মিলে কথা বলতে পেরে কি যে ভাল লাগছে, তা বোঝাতে পারছি না। আপনি অহেতুক সঙ্কোচবোধ করছেন। আমার জন্য অকারণ চিন্তা না করে কি বলবেন, নির্দ্বিধায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত কুণ্ঠা বিদূরিত হল। তিনি বলতে শুরু করলেন: আজ সকালে রাজসভায় আত্মপ্রকাশের পর আমাদের সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে মৎস্যরাজ বিরাট উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন! গন্ধর্বরূপী মহাবল ভীমসেনের পরাক্রমেই যে সসৈন্যে সুশর্মার

পরাজয় হয়েছে শুনে এবং রাজকুমার উত্তরের কাছ থেকে বৃহন্নলাবেশী মহাধনুর্বিদ অর্জুনের এককযুদ্ধে বিশাল কৌরববাহিনীর পরাজয় ঘটেছে জানতে পেরে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। তাৎক্ষণিক আনন্দের আতিশয্যে গুণমুগ্ধ হয়ে তিনি পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো নিবিড় করে তুলতে আমার কাছে অর্জুনের সঙ্গে রাজকুমারী উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করেন। অর্জুন বিনীতভাবে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে যে সে একে প্রৌঢ়, তায় রাজকুমারীর গুরু। উত্তরা তার একান্ত প্রিয় শিষ্যা—দুহিতা তুল্যা। গুরু হয়ে সে কখনো স্নেহাস্পদা শিষ্যাকে বিবাহ করতে পারে না। প্রত্যাখ্যানের সাথে-সাথে সে বিকল্প একটি প্রস্তাব দিয়ে বলে যে তার পুত্র অভিমন্যু বয়ঃপ্রাপ্ত ও সর্বগুণান্বিত। মহারাজা ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। মৎস্যরাজ অর্জুনের সেই বিকল্প প্রস্তাবেই সম্মত হয়েছেন। মহারাজা বিরাট কেবলমাত্র একজন মহাবীরই নন, তিনি উদারচেতা—সর্বোপরি আমাদের আশ্রয়দাতা। তাঁর সুবিস্তৃত রাজত্বে ধনবল ও লোকবলের যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে। অভিমন্যু পাণ্ডব বংশধর হলেও তোমার ভাগিনেয়। আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ে সে তোমার কাছেই মানুষ হয়েছে। তাই তার উপর তোমার অধিকারও আমাদের চেয়ে কম নয়। কৌরব ও পাণ্ডবদের আসন্ন সংঘাতের কথা চিন্তা করে আমি এখনো মনোস্থির করি নি। তোমার সুচিন্তিত মতামতের উপরেই বেশি আস্থা পোষণ করছি। বর্তমান অবস্থায় অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি ?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে সরাসরি প্রশ্ন করে উত্তরের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্যান্য ভ্রাতাদেরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কারণ সকলেই ভালভাবে এটা জানেন যে তাঁর কথার উপরেই তাঁদের ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর করছে। আসন্ন কুরুপাণ্ডব সংঘর্ষের প্রাক্কালে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুধিষ্ঠির যত সহজে শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করলেন, তাঁর পক্ষে তৎক্ষনাৎ উত্তর দেওয়া কিন্তু ততখানি সহজসাধ্য হল না। তিনি চুপ করে নতমস্তকে চিন্তা করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরা যে তাঁর মতামতের উপর অতিরিক্ত পরিমানে নির্ভরশীল, মুখে যুধিষ্ঠির যদি একথা নাও বলতেন, তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। আর সেইজন্যই তাঁর এত চিন্তা! একদিকে যুদ্ধ,

মারনোৎসবং অন্যদিকে বিবাহ, মিলনোৎসব—একই বৃন্তের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত! এ যেন দু'দিকে ধার দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্র! সামান্যতম এদিক ওদিক হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তখন আর কোনপ্রকারেই দুই মেরুকে একসূত্রে গ্রথিত করে হিসাব মেলানো যাবে না। কিন্তু বাসুদেবের অন্তরমুখীন এই গভীর চিন্তারাশি অপসৃত হতে বেশি সময় লাগল না। তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। মনের ভাব অপরকে বুঝতে না দিয়ে তিনি আপন স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় হাসিতে অধর উদ্ভাসিত করে তীর্যকভঙ্গিতে বললেন: ধর্মরাজ! আপনার মত স্থিতধী ব্যক্তির আমাকে এ প্রশ্ন করা উচিত হয় নি। শাস্ত্রকারেরা বংশরক্ষার জন্যই বিবাহের বিধান দিয়েছেন। সংসার ক্ষণস্থায়ী, মানবজীবন পক্ষপত্রে নীরের ন্যায় অনিত্য। ভারত বংশের অনাদাত সংগ্রামে কার ভাগ্যে কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। তাই ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের প্রাক্কালে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ অযৌক্তিক নয়। একটা কথা সব সময়েই মনে রাখবেন মহারাজ, পারস্পরিক দ্বন্দ্বমুখর দিনগুলিতে সামান্যতম শক্তিকেও উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিশেষ করে মৎস্যরাজ বিরাট শক্তিতে সামর্থে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য নৃপতিদের অন্যতম। আপনাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদ—সবই কৌরবদের হস্তগত। এমতাবস্থায় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মহারাজা বিরাট পাশে থাকলে আপনাদের গৌরব প্রভূত বর্ধিত হবে সন্দেহ নেই। আপনি প্রজ্ঞাবান, আপনাকে বেশি কথা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু দাদা! আজ এই পর্যন্ত! যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে কাল বিস্তারিত আলোচনা করব।

যুধিষ্ঠির বা অন্য কাউকে কোনও কথা বলার অবকাশ না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্রুত স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন!

## ॥ পাঁচ ॥

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ হয়ে গেল! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজা চক্রবর্তী। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্বকালে রাজসূয় যজ্ঞ করে তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় মহারাজা থেকে মহারাজা চক্রবর্তীতে

উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু কৌরবদের হীন চক্রান্তে অক্ষক্রীড়ায় ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটায় তিনি বারো বছর বনবাসের পর অজ্ঞাতবাসকালে ভাইদের ও দ্রৌপদীকে নিয়ে মৎস্যরাজ্যে মহারাজা বিরাটের আনুকুল্যে ছদ্মবেশে চাকুরীজীবী হয়ে পরাশ্রমে ও পরান্নে জীবনযাপন করেছেন। যদিও এই সময় বিরাট নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই পাণ্ডবদের অপরাপর বেতনভুক কর্মচারীর মতই নিয়োজিত করেছেন, তবুও তাঁদের আত্মপ্রকাশের পর সব কথা জানতে পেরে তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না। মহারাজা চক্রবর্তী ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির মহাশক্তিধর অমিত বীর্যশালী ভীমসেন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ অপরাজেয় অর্জুন, বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ নকুল ও প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ সহদেবের সঠিক পরিচয় না জানায় হয়তো বা তিনি তাঁদের যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি ভেবে তাঁর অন্তর বেদনায় ভরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পাণ্ডবকুললক্ষ্মী পট্ট মহারাণী দ্রৌপদীর উপর তাঁর শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের দুর্ব্যবহার তাঁর হৃদয়কে অপরিসীম দুঃখে আপ্লুত করে তুলেছিল। পাণ্ডবদের সৌজন্যে, সারল্যে, উদারতায় ও সত্য—বাদিতায় তিনি কেবলমাত্র বিস্মিতই হন নি; ত্রিগর্তবাহিনী ও কৌরববাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে ভীমার্জুনের বিশেষত অর্জুনের অসাধারণ বীরত্ব ও শক্তিমত্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এই আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ প্রাণাধিক দুহিতা উত্তরাকে অর্জুনের হাতে সম্প্রদান করে পাণ্ডবদের আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর সমস্ত চিত্তক্ষোভের অবসান ঘটাতে চাইলেন। অর্জুনের বিবাহে অসম্মতি ও পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব, মৎস্যরাজ বিরাটের স্বীকৃতি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি, মহারাণী দ্রৌপদীর ঐকান্তিক ইচ্ছা, সর্বোপরি আত্মপ্রকাশের দিন রাত্রিবেলায় শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় সর্বশেষ উক্তি এই বিবাহকে ত্বরান্বিত করে তুলল।

মহারাজ চক্রবর্তী হয়ে যুধিষ্ঠির মৎস্যদেশের রাজধানীতে একই প্রাসাদে মহারাজা বিরাটের সঙ্গে বসবাস করায় পাছে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজন্য বৃন্দের কাছে নিন্দিত হন, তাই বিবাহ প্রস্তাবের অচিরকাল মধ্যে বিরাট দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত উপপ্লব্য নগর পাণ্ডবদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সমর্পণ করেছেন। তিনি তাঁদের ও তাঁদের অপর্যাপ্ত দাসদাসী এবং সৈন্যসামন্তদের জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু অট্টালিকা নির্মাণ করে, ইতর প্রাণীদের জন্য অসংখ্য অশ্বশাল হস্তীশালা

ও গোশালা তৈরি করেন। যাতায়াত ও যানবাহন চলাচলের জন্য অনেক রাস্তাঘাট প্রস্তুত করে এবং পর্যাপ্ত পানীয়ের জন্য অগনীত তড়াগ পুস্করিণী কূপ প্রভৃতি খনন করে সমগ্র নগরকে সর্বপ্রকারে বাসের উপযোগী করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত বংশধর অভিমন্যুর বিবাহকার্যে পাণ্ডবদের মনোবেদনা বিদূরিত করতে তিনি আয়োজন-অনুষ্ঠানের এতটুকু ত্রুটি কোথাও রাখেন নি। তাঁর রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, পার্থিব কোনও কিছুর বিন্দুমাত্র অভাব নেই। প্রকৃতির অযাচিত অকৃপণ দানে তাঁর রাজ্য অন্যান্য দেশ থেকে ঐশ্বর্য, সম্পদ শষ্য, গাভী, অশ্ব, হস্তী, লোকবল ও সৈন্যবলে বলীয়ান। বিবাহের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রকট হয়ে উঠল।

উত্তরা মহারাজা বিরাটের পরম স্নেহধন্যা ও অতিশয়ে আদরের দুহিতা। কন্যার সামান্যতম তৃপ্তিসাধন ও মুখের হাসি অম্লান রাখার জন্য তাকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। পিতার আনুকুল্যে আশৈশব সে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিপালিতা হয়েছে। লেখাপড়া প্রভৃতি পুঁথিগত বিদ্যা, আচার-আচরণ সৌজন্য-শিষ্টাচার প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যা এবং নৃত্য-সঙ্গীত-অঙ্কণ প্রভৃতি চারুকলা বিদ্যায় তিনি কন্যাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন! প্রাণপ্রতিম কন্যার পাত্ররূপে তিনি যাকে মনোনিত করেছেন, সেই অভিমন্যুও অনন্যতুল্য শিক্ষাদীক্ষায়, অসামান্য বীর্যবত্তায়, অনিন্দিত দেহকান্তিকে ও সুউন্নত বংশমর্যাদায় কারো অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়। পাত্র হিসাবে সে খুবই আকর্ষনীয়। মাত্র ষোল বছর বয়সেই সে সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা চক্রবর্তী ভারতী বংশধর সে, বৃষ্ণিকুলসিংহ যাদবপ্রধান অবতারকল্প পরমপুরুষ শ্রেষ্ঠ কুটনীতিবিদ বাসুদেব তার মাতুল, অপরাজেয় সমরনায়ক গাণ্ডীবধন্য তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ তার পিতা এবং অপূর্ব লাবন্যময়ী যাদবদুহিতা বীরাঙ্গনা সুভদ্রা তার জননী। এ হেন উপযুক্ত পাত্রের হাতে প্রাণাধিক দুহিতা উত্তরাকে সমর্পণ করতে পেরে মহারাজা বিরাট আজ আনন্দিত গর্বিত ও হর্ষিত!

প্রিয়সখা ধনঞ্জয় ও কনিষ্ঠা ভগ্নী সুভদ্রার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অত্যন্ত রহস্যাবৃত হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্র বরাবরই দুর্জ্ঞেয়, সর্বপ্রকার সমালোচনা উর্ধ্বে ও সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মনের কথা তিনি কখনো মুখে প্রকাশ করেন না অথবা তাঁর স্মিত অধরে মানস-অভিব্যক্তি ফুটে উঠে না। রহস্যময় তাঁর উক্তি, রহস্য ঘেরা তাঁর অন্তর, রহস্যাচ্ছাদিত তাঁর কার্যও রহস্যসঙ্কুল তাঁর পদক্ষেপ সমস্ত ব্যাপারে রহস্যের অপার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য! অভিমন্যুর বিবাহে ও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সকল প্রকার নাগালের বাইরে বহুদূরে রইলেন। তাঁর বাহ্যিক নিরপেক্ষ আচরন প্রশ্নাতীতভাবে সাফল্য লাভ করেছে সন্দেহ নেই, অথচ পাণ্ডবদের প্রতিটি কার্য তারই রহস্যে ভরা ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে। পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার পর থেকে শুরু করে পাণ্ডবেরা বার বার শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করে এসেছেন। বনবাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত হয়ে তাঁদের সেই পরম নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে গেছে। অজ্ঞাতবাসের অবসানে কৌরবদের সাথে মুখোমুখি দ্বন্দ্বে তাঁদের নিঃসম্বল অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণই অন্যতম পরামর্শদাতা। ভগ্নী সুভদ্রার মতন ভাগিনেয় অভিমন্যুর উপরও তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাকে সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে আজ পিতার ন্যায় অন্যতম ধনুর্বিদ বলে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। সেইজন্য একান্ত স্নেহাস্পদ ভাগিনেয়ের বিবাহে তাঁর নিরপেক্ষতা স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমবেত রাজন্যবৃন্দ ও রাজ-পুরুষদের সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠে।

অভিমন্যুর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের আর পাঁচজন নিমন্ত্রিত আত্মীয়দের মতই একজন আত্মীয় মাত্র। এর বেশি পরিচয় তিনি কোথাও দেন নি অথবা কর্তব্যের মোহে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে প্রয়াসী হন নি। বাইরে তিনি এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলেও রাজ্য-হারা পাণ্ডবেরা সম্পদহীনতার জন্য নতুন বৈবাহিক মৎস্যনৃপতির কাছে যাতে ছোট হয়ে না যান, সেদিকে কিন্তু তাঁর লক্ষ্য সজাগ ছিল। বিবাহ এবং আসন্ন কৌরব সংঘর্ষের কথা চিন্তা করে তাঁরই পরামর্শ অনুসারে যাদবগোষ্ঠীর অগণিত হস্তী, অশ্ব, গাভী প্রভৃতি ইতর প্রাণী; বহুল সংখ্যক অস্ত্র, বর্ম, রথ প্রভৃতি সমরোপকরণ; প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার, বস্ত্র শয্য প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি সৈন্য সামন্ত এবং গননাতীত দাসদাসী,

নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা, পাচক-পাচিকা, ভারবাহী প্রভৃতি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ উপঢৌকন দিয়েছিলেন। বাইরের আড়ম্বর যখনই বড় হয়ে উঠে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তখনই গৌণ্যের ভূমিকা মুখ্য হয়ে দেখা দেয় আর সর্পে রজ্জুভ্রম হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। উপঢৌকনের অস্বাভাবিক প্রাচুর্য উপস্থিত রাজন্যবর্গের দৃষ্টিকে এতখানি আচ্ছন্ন করে দিল যে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু শ্রীকৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে রয়ে গেলেন!

অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষতাব নির্মোক গ্রহণ করলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি কিন্তু নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। তাঁর চিন্তাশীল অন্তরে সে যুগের বিবাহপ্রথা বিশেষ করে পাণ্ডবদের ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের বিবাহগুলি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অভিমন্যুর বিবাহ পাণ্ডব বংশধরদের প্রথম বিবাহ হলেও সমকালের অধিকাংশ রাজবংশের মতন তাঁদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা একদিকে যেমন আইনসম্মত, অন্যদিকে তেমনি সর্বজন-স্বীকৃত। তখনকার দিনে অনেক রাজা ও রাজবংশই একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। যাদবগোষ্ঠীর বৃষ্ণিবংশীয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এর ব্যতিক্রম নন,—সে কথা শ্রীকৃষ্ণ ভাল করেই জানেন। তাঁর বিবাহ সে যুগে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। রাজা না হয়েও তিনি অগণিত বিবাহ করেছেন। সমকালীন যুগে বহুবিবাহের ফলও ছিল সুদূর-প্রসারী। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহগুলি সহায়ক হয়ে উঠেছে। পাণ্ডবেরাও ছিলেন বহুপত্নিক। তাঁদের পূর্বপুরুষেরাও একাধিক বিবাহ করেছেন। হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজা শান্তনু, তাঁর তৃতীয় পুত্র মহারাজা বিচিত্রবীর্য এবং বিচিত্রবীর্যের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজা পাণ্ডু দ্বিপত্নীক ছিলেন। শান্তনু প্রথমে বিবাহ করেছেন গঙ্গাদেবীকে ও পরে দাসরাজ-কন্যা সত্যবতীকে, বিচিত্রবীর্য পাণিগ্রহণ করেছেন কাশীরাজের দ্বিতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার এবং পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী ছিলেন পৃথা বা কুন্তীদেবী ও দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন মাদ্রীদেবী। পৃথাদেবী ছিলেন যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগ্নী, শূরসেনের পিসতুতো ভাই অনপত্য মহারাজা কুন্তিভোজ তাঁকে দত্তক

কন্যারূপে গ্রহণ করায় তাঁর নাম হয়েছিল কুন্তীদেবী। মাদ্রীদেবী ছিলেন মদ্রাধিপতি অর্তায়নের কন্যা ও মহাবীর শাল্যের ভগ্নী।

পাঞ্চালনৃপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীই বৈদিক মতানুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রথম বিবাহিতা পত্নী। তারপর পাণ্ডবেরা সকলেই এক বা একাধিক বিবাহ করেছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবাহ করার পরে আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল দেবিকা। তিনি ছিলেন গোবাসন শৈব্যের কন্যা। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন আগে ও পরে আরো তিনটি বিবাহ করেন। এঁরা হলেন মহাবল অনার্য হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগ্নী হিড়িম্বা, কাশীরাজের দুহিতা বীর্যশুল্কা বসুন্ধরা এবং মদ্ররাজ শল্যের ভগ্নী কালী। তৃতীত পাণ্ডব ধনঞ্জয়ও আরো তিনবার পাণিগ্রহণ করেন। এই তিনজন পত্নী হলেন ঐরাবত কুলের নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী, মণিপুররাজ চিত্রবাহনের দুহিতা চিত্রাঙ্গদা এবং বসুদেব-রোহিণীর কন্যা সুভদ্রা। নাগরাজ কন্যা সুন্দরী উলুপীর সঙ্গে অর্জুনের ঠিক অনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নি, দৈহিক মিলন ঘটেছিল। বিবাহের অল্পদিন পরে স্বামী সুপর্ণ অপহৃত হলে বিরহ-বিধুর উলুপী ব্রহ্মচর্যব্রতরত অর্জুনের রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় দেহদান করেন আর সেই তাৎক্ষণিক মিলনের ফলে তিনি পুত্রবতী হন। পরম নিষ্ঠায় আজীবন একথা তিনি স্মরণে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতে অন্য কোনও পুরুষকে সঙ্গদান করেন নি। চতুর্থ পাণ্ডব নকুলও আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী করেণুমতী ছিলেন চেদিপতি শিশুপালের দুহিতা ও মহাবল ধৃষ্টকেতুর ভগ্নী। পঞ্চম পাণ্ডব অনিন্দ্যসুন্দর সহদেবও আরো দুটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের প্রথমজন হলেন মদ্ররাজ শল্যের দুহিতা বিজয়া আর দ্বিতীয়জন হলেন মগধাধিপতি জরাসন্ধের এক কন্যা। পাণ্ডব বংশধরদের মধ্যে তখন পর্যন্ত একমাত্র অভিমন্যুরই বিবাহ হয়েছে, অন্যান্য কারো বিবাহ হয় নি।

পাণ্ডবদের এই বহুবিবাহের কথা শ্রীকৃষ্ণ যতই চিন্তা করেন, ততই অবাক হন! তাঁদের সমস্যাসঙ্কুল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনাবর্তে এই বিবাহগুলি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এর বহুদূরব্যাপী সুফল লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও

বিবাহ যেমন তাঁদের ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়ক হয়ে উঠেছে, আবার কোনও কোনও বিবাহ তেমনি তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বর্ধিত করে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। এদের মধ্যে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের এবং উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাণ্ডবদের ভাগ্যাকাশ যখন দুর্যোগের ঘনঘটায় সমাকীর্ণ, চতুর্দিকে অম্বরচুম্বী অন্ধকার অমারাত্রির দুর্ভেদ্য আস্তরণ ও সমস্যার পর সমস্যায় বিপর্যয়োন্মুখ ক্লান্তিকর জীবন দুর্বিসহ গ্লানিতে ভরপুর; তখনই চলমান জীবনের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুই পুরুষের এই দুটি বিবাহ যেন সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

বিবাহের পরের দিন সকলেবেলায় মৎস্যাধিপতি বিরাটের আনুকূল্যে ও পাঞ্চাল নৃপতি দ্রুপদের উৎসাহে পাণ্ডবদের হারানো রাজ্য কি করে কৌরবদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে সভাদেশে উত্তরার বিবাহমণ্ডপে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ থেকে পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী যে সব রাজারা, রাজপুত্রেরা ও ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষেরা এই বিবাহ উপলক্ষ্যে সেখানে এসেছিলেন; সকলেই একে একে সমবেত হলেন। বর্ষীয়ান মহারাজা দ্রুপদ ও মহারাজা বিরাট সেই সভায় আসনগ্রহণ করলে যাদবপ্রধান বসুদেব প্রভৃতি বয়স্ক অতিথিরা উপবেশন করলেন। পরে যাদববীর সাত্যকি ও বলরাম পাঞ্চালরাজের এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের কাছে বসলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সুরথ, শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক, জয়াশ্ব, দৌমুখী, জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্তিধর্মা, ধ্রুব, অধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র ও সুতেরজন প্রভৃতি দ্রুপদের আঠারজন পুত্র, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবেরা চার ভাই, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, ভানু প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রেরা; শঙ্ক, উত্তর বা ভূমিঞ্জয়, শ্বেত, প্রভৃতি বিরাটের পুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রতিবন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন, দেবিকার পুত্র যৌধেয়, হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ, বলন্ধরার পুত্র সর্বগ, কালীর পুত্র সর্বগত,

করেণুমতীর পুত্র নিরমিত্র, বিজয়ার পুত্র সুহোত্র প্রভৃতি পাণ্ড বংশধরেরা একে একে উপবেশন করলেন। মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য রাজ রাজপুত্রগণ ও রাজপুরুষেরা যে যাঁর নির্দিষ্ট আসন অলঙ্কৃত ক সভার গৌরবকে বাড়িয়ে তুললেন।

পাণ্ডবদের পরমহিতৈষী শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ সকলের উপস্থিতির জন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরই রহস্যময় ইঙ্গিতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এ সভা অনুষ্ঠানে আগ্রহী হয়ে ওঠায় এবং মৎস্যরাজ ও পাঞ্চালরাজ বিশে উদ্যোগী হওয়ায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। সকলের অলক্ষে তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে কাঁরা কাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, তা দেখতে লাগলেন। এই সভায় তিনি কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, ও দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রদের ব কৌরবপক্ষীয় দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, শকুনি, বিদুর, সঞ্জয়, অশ্বত্থাম প্রভৃতি কাউকেই দেখতে পেলেন না। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বা তাঁর ভ্রাতারা, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্ত, কোশলনৃপতি বৃহদ্‌বল, সিন্ধু-শ্বর জয়দ্রথ, অবন্তীঅধিপতি বিন্দু, কাম্বোজনৃপতি সুদক্ষিণ, মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজ প্রভৃতি বহু রাজাই অনুপস্থিত। এঁদের কারো উপস্থিতিও বাসুদেব আশা করেন নি, কারণ এঁরা সকলেই কৌরবদের মিত্রশক্তি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজা বা রাজপ্রতিনিধিরা না আসায় সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌরবদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাণ্ডবদের প্রভাব যে ইতিমধ্যে অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে বুঝতে পারলেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষের বহু রাজা, রাজপুত্রগণ ও রাজপুরুষদের সেখানে দেখতে পেয়ে প্রভূত পরিমাণে আশ্বস্ত হলেন।

সভামণ্ডপে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক কুশলাদি প্রশ্নের অবসান ঘটলে বাসুদেব স্বভাবসুলভ হাস্যসহকারে অথচ দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের স্বরে সমবেত নৃপতি ও বীরবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে রাজন্যবর্গ ও উপস্থিত বীরবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন, মহারাজা চক্রবর্তী ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির কৌরবপতি দুর্যোধনের হীন চক্রান্তে গান্ধাররাজ সুবলনন্দন ঘৃণ্য শকুনির ছলনায় কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যহারা হয়ে দীর্ঘকাল অশেষ দুঃখকষ্টের

মধ্যে কাটিয়েছেন। পাণ্ডবেরা বরাবরই সৎ, ধার্মিক ও সত্যবাদী প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ থাকার জন্যই তাঁরা এতদিন তাঁদের সমস্ত অন্যায় নির্বিচারে মুখ বুজে সহ্য করেছেন, তবু কোনদিন এর বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি। তাঁদের প্রতিশ্রুত বনবাসের বার বছর ও অজ্ঞাত-বাসের এক বছর অনেক আগেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু হীনচেতা মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন শঠতায় উপার্জিত হৃতরাজ্য আজো তাঁদের ফিরিয়ে দেন নি, পরন্তু সঙ্গতভাবে প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যাধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা সকলেই আপনাদের পরিচিত। এখন উভয়ের পক্ষে যা হিতকর, ধর্মানুগ, যশস্কর ও উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন, তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সবাইকে অনুরোধ করছি। মনে রাখবেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মার্জিত একটি গ্রামও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মত প্রাপ্ত অর্ধেক রাজ্যের অধিকারও হারাতে চান না। পাণ্ডবেরা শক্তিমত্তায় কৌরবদের চেয়ে যে কোনও অংশে ন্যূন নন, ঘোষ-যাত্রায় ও উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে তা প্রমাণিত হলেও বাহুবলের প্রয়োগ তাঁদের অভিপ্রেত নয়। শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুষ্ঠু মীমাংসাই তাঁদের ঈপ্সিত। পাণ্ডবেরা আমাদের সকলেরই পরমাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ধার্তরাষ্ট্রেরা যদি শান্তির পথ পরিহার করে এবং পাণ্ডবদের সঙ্গত অর্ধেক রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে শেষপর্যন্ত হিংসাশ্রয়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হন, তবে আমরা নিশ্চয়ই অধর্মপক্ষকে পরিত্যাগ করে ধর্মপক্ষ অবলম্বন করব। কিন্তু এখনো আমরা এ সম্বন্ধে দুর্যোধনের মনোভাব কি, তা পরিস্কার জানতে পারি নি। সবার আগে তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এর উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যধারা নির্ভর করছে। তাই আমার অনুরোধ, যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য প্রদান করে কৌরবদের সন্ধি করার প্রস্তাব দিয়ে একজন ধার্মিক, কুলীন ও প্রমাদশূন্য দূত অবিলম্বে আপনারা দুর্যোধনের কাছে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীকৃষ্ণের এই যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘভাষণ সবার অন্তর স্পর্শ করল এবং বলরাম ব্যতীত উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সমস্বরে 'সাধু, সাধু' বলে তা সমর্থন করলেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে আনন্দের আতিশয্যে বিগত

রাত্রিতে বলরাম অতিরিক্ত মদ্যপান করায় তখনো পর্যন্ত তাঁর দু'চোখ ছিল আরক্ত. তন্দ্রায় বিজড়িত। নেশার ঘোর না কাটায় ছোট ভাই শ্রীকৃষ্ণের সব কথা তিনি শুনতে পান নি. কিন্তু শেষদিকে ভাইয়ের সন্ধির প্রস্তাব তাঁর ভাল লাগল। খানিকটা বুঝে আর খানিকটা না বুঝে তিনি অসংলগ্নভাবে বললেন ঃ বাসুদেবের সন্ধির প্রস্তাব উপযুক্ত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের সন্ধি করাই উচিত। কৌরবরাজ দুর্যোধন এখন সমগ্র রাজ্যের অধিশ্বর। যুধিষ্ঠির অবিবেচনার মতন দ্যুতক্রীড়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রাজ্য হারিয়েছেন, তার জন্য দুর্যোধনের নিন্দা করা যায় না। যুধিষ্ঠিরই সবচেয়ে দোষী, ঠিক মত অক্ষক্রীড়া না জেনে গান্ধাররাজপুত্র শকুনির ন্যায় দক্ষ ক্রীড়াকুশলীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিহীনতার জন্যই পাণ্ডবেরা রাজ্যহারা হয়ে বনবাসে যাত্রা করেছেন। এতে দুর্যোধন বা শকুনির দোষ কোথায়? এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরই সম্পূর্ণ দায়ী। সমস্ত দোষ তাঁর। তাই আমার মতে কৌরবদের বুঝিয়ে সুজিয়ে সন্ধি করাই সমীচীন। সে-জন্য অবিলম্বে হস্তিনাপুরে একজন দূত পাঠানো আবশ্যক। সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, অমাত্য বিদুর, সুবলনন্দন শকুনি, মহারথী কর্ণ, মহাবল অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য ধার্মিক, বিবেচক ও বয়োবৃদ্ধ পুরবাসীদেরা কাছে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যা হিতকর, তা সুন্দর করে মার্জিত ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে জানানো হোক। কৌরবের পাণ্ডবদের বর্তমান দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পারলে নিশ্চয় সাহায্য করবেন বলে আমার তো মনে হয়!

বলরামের কথায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর কথার কোনও উত্তর দেওয়া তখনি তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। স্থান, কাল ও পাত্র বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে বলরাম যে কথা বলেছেন, তা আলোচনা সভার তাৎক্ষণিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই প্রতিকূল অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কি করবেন, ঠিক করতে না পেরে তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁকে নীরব থাকতে দেখে যাদবপ্রধান সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে বলরামকে তিরস্কার করে বলে উঠলেনঃ তুমি তোমার স্বভাবের অনুরূপ কথাই বলেছ। কোনও সময়েই কি তুমি চিন্তা করে কথা বলতে পার না! পরশ্রীকাতর

কৌরবেরা রাজ্যলোভে কপট দ্যূতক্রীড়ায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছেন। এতে তাঁর অপরাধ কোথায়? বরং কৌরবেরাই অপরাধী। কিন্তু ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির সব বুঝতে পেরেও যে সত্যের অপলাপ করে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নি, সেজন্য তাঁরই প্রশংসা করা উচিত। তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বার বছর বনবাসে ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদী ও ভাইদের সঙ্গে অশেষ দুঃখ-কষ্ট উপভোগ করেছেন। কিন্তু কৌরবেরা এখন সত্যভঙ্গ করে পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য তাঁকে প্রত্যর্পণ করছেন না, পরের রাজ্য অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে রেখেছেন। আমার মনে হয়, রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধই শ্রেয়। দুরাত্মা দুর্যোধন যদি স্বেচ্ছায় রাজ্য প্রত্যর্পন না করেন, তবে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে তা উদ্ধার করব। তাঁর কাছে আর কোন প্রকার আবেদন-নিবেদন বা অনুনয়-বিনয় করার প্রয়োজন নেই। এতে অন্তরের দুর্বলতাই ফুটে ওঠে।

পাঞ্চালপতি দ্রুপদ বরাবরই কৌরববিদ্বেষী। পঞ্চপাণ্ডব তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ আপনজন, প্রিয়কন্যা পট্টমহারাণী দ্রৌপদীর স্বামী। কৌরবদের নীতিবহির্ভূত কার্যকলাপে দীর্ঘকাল ধরে কন্যা ও জামাতাদের দুর্বিষহ দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি আর থাকতে না পেরে মহাবীর সাত্যকিকে সমর্থন করে বললেনঃ মহামতি সাত্যকি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি তাঁর উক্তিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। দুর্যোধন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী কৌরবেরা সকলেই পাপাত্মা, দুষ্টবুদ্ধি ও অধর্মাচারী। মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করে তাঁদের সন্তুষ্ট করা যাবে না, সৎ ব্যবহারে ওঁদের মতি পরিবর্তিত হবে না এবং সন্ধির সঙ্গত প্রস্তাবকে তারা চরম দুর্বলতা বলে উপেক্ষা করবেন। আমার মতে, আর কাল বিলম্ব না করে এখুনি যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মিত্রশক্তি ও রাজন্যবৃন্দের সাহায্য প্রার্থনা করে সকলের কাছে দূত প্রেরণ করা আবশ্যক। আপনারা সকলেই জানেন, প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যে পক্ষ সর্বাগ্রে সাহায্যপ্রার্থী হন, সাধারণত রাজারা সেই পক্ষই অবলম্বন করে থাকেন।

মৎস্যনৃপতি বিরাট মহারাজা দ্রুপদের উক্তিতে সানন্দে হর্ষধ্বনি

করে উঠলেন। তিনি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেনঃ পাঞ্চাল অধিপতি মহারাজা দ্রুপদ এখানে উপস্থিত প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কথা অত্যন্ত যুক্তি-সিদ্ধ। তিনি যা যা বলেছেন, সবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর একটি কথাও উপেক্ষণীয় নয়। পাণ্ডবদের স্বার্থের বিষয় চিন্তা করে আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধু হিসাবে আমরা যাঁরা এখানে রয়েছি, আমার তো মনে হয়, আমাদের কারো মধ্যেই এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত নেই।

মৎস্যরাজ বিরাটের কথায় আনন্দিত হয়ে মহারাজা দ্রুপদ আবার বললেনঃ উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও সুধীবৃন্দ! সকলে আমার কথা সমর্থন করায়, আমি বিশেষ গর্ব অনুভব করছি। আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। আসন্ন সংগ্রামে সাহায্যের প্রার্থনা করে বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণের আগে হস্তিনাপুরের রাজসভায় সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে একজন ধার্মিক, বয়স্ক ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দূত হিসাবে পাঠানো হোক। আপোসে সন্ধি হয় ভাল, তা না হলে পরে যুদ্ধের জন্য যা যা করণীয়, সেই সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমার কুলপুরোহিত অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, প্রজ্ঞাবান ও সজ্জন ব্যক্তি। আপনারা যদি অনুমতি করেন, তবে তাঁকেই যুধিষ্ঠিরের দূত করে প্রেরণ করার বন্দোবস্ত করি।

অর্বাচীনের মত বলরামের অবিবেচনাপ্রসূত উক্তিতে এই আলোচনা সভায় যে প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছিল, তা যাদবপ্রধান সাত্যকির তিরস্কারে ও যুদ্ধ আয়োজনের প্রস্তাবে এবং মহারাজা দ্রুপদ ও মহারাজা বিরাট সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করায় অবস্থা অনুকূলে চলে এল। পরিস্থিতির এই রূপান্তরে বাসুদেব উৎফুল্ল হলেন, তাঁর অধর স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি নিরপেক্ষতার নির্মোকে রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেনঃ মহারাজা দ্রুপদ ও মহারাজা বিরাট পাণ্ডবদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও প্রাজ্ঞবৃন্দের কাছে যে সব প্রস্তাব রেখেছেন, সেগুলি অতি অবশ্যই গ্রহণীয়। তাঁদের প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী হয়েছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আজকের সভায় উপস্থিত

সুধীজনের মধ্যে মহারাজা দ্রুপদই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ও শস্ত্রবিদ কৃপাচার্যের সখা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে বিশেষ মান্য করেন। তাই তাঁকে মৎস্যরাজ বিরাটের সঙ্গে পরামর্শ করে এ সম্পর্কে যা করা আবশ্যক, তা করতে অনুরোধ করছি। পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা—উভয় পক্ষই আমাদের আত্মীয়। কারো সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নেই। আমরা অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। বিবাহ হয়ে গেছে। এখন আমরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে যে যাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করব। যদি দুর্যোধন ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত ভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হন, তাহলে কুরুপাণ্ডবের সৌহার্দ্যনাশ বা কুলক্ষয় হবে না। কিন্তু যদি দুর্বুদ্ধিবশত দর্পিত হয়ে তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তবে আসন্ন ভারত সংগ্রামে কৌরবদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একা অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে সমগ্র কৌরবশক্তির নিস্তার নেই।

অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় ভূমিকা চিরকালের জন্য রহস্যাবৃতই হয়ে রইল!

## ॥ ছয় ॥

মৎস্যদেশে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের আত্মপ্রকাশের পর কৌরবদের সমগ্র রাজ্যাধিকার বজায় রাখতে এবং পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে অচিরকাল মধ্যেই যে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু পাণ্ডবদের অনেক আগে থেকেই মহারাজা দুর্যোধন মিত্রশক্তি বৃদ্ধি ও সৈন্যসংখ্যার পরিধি বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছেন। পাণ্ডবেরা মিত্র রাজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত রথীদের অন্বেষণ শুরু করেছেন দ্রুপদ পুরোহিতের দৌত্য ব্যর্থ হবার পরে, কিন্তু কৌরবদের এই কার্যের সূচনা ঘটেছে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহের পূর্বে। তার উপর দুর্যোধনের কোনদিনই ন্যায়, নীতি, বিবেক ও মনুষ্যত্বের কোনও বালাই ছিল না। কার্যোদ্ধার করতে যে কোনও নিকৃষ্টতম পন্থাও অবলম্বন

করতে তিনি দ্বিরুক্তি করতেন না। এই চাতুর্যের সাহায্যেই তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় মদ্রাধিশ্বর শল্যকে নিজের দলভুক্ত করেন। নতুন করে এই ঘটনা প্রমাণিত করল, পাণ্ডবেরা ন্যায়-নীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার ও বীর্যবত্তায় যত দক্ষতারই পরিচয় দিন না কেন, কূটকৌশল ও ভেদনীতিতে তাঁরা আদৌ ধার্তরাষ্ট্রদের সমকক্ষ নন।

মহাবীর শল্য সম্পর্কে পাণ্ডবদের মাতুল, মহারাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীদেবী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা। তাঁর সমরকৌশল ও অসাধারণ বীরত্বের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি পাণ্ডবদের সবাইকেই খুব স্নেহের চোখে দেখেন, অত্যন্ত ভালবাসেন; বিশেষত ধর্মপ্রবণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। তাই ভাগিনেয় প্রেরিত দূতের মুখে কুরুপাণ্ডবের আসন্ন যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করে তিনি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন নি। সংবাদ প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক রকম তিনি অর্ধযোজন বিস্তৃত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য উপপ্লব্য নগরের দিকে অগ্রসর হলেন। মদ্রদেশ থেকে মৎস্যদেশ অনেকদিনের পথ। সৈন্যরা যাতে দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলতে লাগলেন। মহারাজা দুর্যোধন গুপ্তচরের কাছে এই খবর পেয়ে চিন্তিত হলেন। তিনি কৌশল অবলম্বন করে মাঝপথে বহু অর্থব্যয়ে সুনিপুণ শিল্পীদের দ্বারা নানাবিধ কারুকার্যখচিত এক সুন্দর সভামণ্ডপ নির্মাণ করে মহারাজ শল্যের রাজকীয় সংবধনার বিপুল আয়োজন করলেন। সরলহৃদয় উদারচেতা মহাবীর শল্য পূর্বাহ্নে দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনের নেপথ্য হস্তক্ষেপের কথা জানতেও পারলেন না। এরূপ রমণীয় সভামণ্ডপে সংবর্ধিত হয়ে তিনি এতদূর আনন্দিত হলেন যে পরিচারকদের ডেকে বললেনঃ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই মনোরম সভামণ্ডপ নির্মাণনৈপুণ্যে আমি প্রীত হয়েছি। যে শিল্পী এর নির্মাণকার্যের পরিচালনা করেছে, আমি তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

পরিচারকেরা দুর্যোধনকে সব কথা নিবেদন করল। তিনি অতি সাধারণ বেশে খুব তাড়াতাড়ি শল্যের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি আপনার জন্য এই সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়েছি। আপনি তৃপ্ত

হয়েছেন জেনে আমার আনন্দের সীমা নেই। আপনার ন্যায় মহাবীরের জন্য এ আয়োজন অতি সামান্য। তবু আপনার ভাল লেগেছে, সে আপনারই বদান্যতা।

মহারাজা শল্য দুর্যোধনকে চিনতে না পেরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললেনঃ না, না স্থপতি! তোমার কথা ঠিক নয়। তুমি বিনয়ী, তাই আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হচ্ছো। তুমি কি পুরস্কার চাও, নির্ভয়ে বল? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব।

কূটনীতিবিদ দুর্যোধন শল্যের উক্তিতে উল্লাসিত হলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম করে বিনীতভাবে বললেনঃ মাতুল! আপনি আমার প্রণম্য, গুরুজন। আপনার সত্যনিষ্ঠা দেশবিখ্যাত, আপনার কথার কোনদিন নড়চড় হয় নি। আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। আমি মহারাজা দুর্যোধন। পাণ্ডবদের মতন আমিও আপনার ভাগিনেয়, স্নেহ ও আশীর্বাদের পাত্র। আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনি আমার সেনাপতি হয়ে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। আপনি আমায় অভয় দিয়েছেন বলেই একথা বলতে সাহস করছি।

নিষ্ঠুর কিরাতের ছলনায় জালে আবদ্ধ হয়ে পশুরাজ সিংহ যেমন হতাশায় ছটফট করতে থাকে, দুর্যোধনের কূটকৌশলে প্রতিশ্রুতির জালে বদ্ধ হয়ে মহারাজা শল্যের অবস্থা তেমনি শোচনীয় হয়ে উঠল। নিরুপায় হয়ে সত্যভঙ্গ ভয়ে তবু তিনি বললেনঃ বৎস দুর্যোধন আমি প্রতিশ্রুত, ইচ্ছে না থাকলেও এর বিকল্প কোনও পথ নেই। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তোমার সৈনাপত্য আমি নিশ্চয় গ্রহণ করব কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ তুমি রক্ষা কর। আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মদ্রদেশ থেকে এতদূরে এসেছি। তা যখন হবার উপায় নেই, তখন যুদ্ধের আগে অন্তত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমাকে দাও।

কৌশলে কার্যসিদ্ধ হয়েছে দেখে দুর্যোধন এতে আর কোনও আপত্তি করলেন না। ব্যর্থকাম শল্য উপপ্লব্য নগরে এসে যুধিষ্ঠিরকে সব কথা বললেন। বার বার তিনি নিজের হটকারিতা, নির্বুদ্ধিতা ও

অসহায়তার কথা স্মরণ করে দুঃখ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের অন্তরে তাঁর মর্মবেদনা স্পর্শ করল। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ মাতুল! যা ভবিতব্য, তা হবেই। তা নিয়ে অকারণ ভেবে কোনও লাভ নেই। কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে আপনারা দৈহিক শক্তির সাহায্য না পেলেও আপনার আশীর্বাদ ও আত্মিক সমর্থন থেকে যেন কোনদিন বঞ্চিত না হই—এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। মাতুল! আপনি নিশ্চয় জানেন, দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনের কুকর্মের প্রধান সহায়ক মহারথী কর্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধই আমার বিশেষ উদ্বেগের কারণ। বীরত্বে আপনি বৃষ্ণিকুলতিলক বাসুদেবের সমকক্ষ। আমার অনুরোধ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সারথি হতে স্বীকৃত হয়েছেন, আপনিও তেমনি কর্ণের সারথ্য স্বীকার করবেন। আর সারথি হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে সতর্কতার সঙ্গে দুটি কাজ করতে হবে—কর্ণের হাত থেকে যুদ্ধের সময় কৌশলে অর্জুনকে রক্ষা করতে হবে এবং কর্ণের গগনচুম্বী দম্ভ ও অতলান্ত অহমিকায় আঘাত হেনে তাঁকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে তাঁর তেজ ও শক্তি হরণ করতে হবে।

মহারাজা শল্য যুধিষ্ঠিরের কথায় সম্মত হয়ে হৃষ্টচিত্তে সেখান থেকে হস্তিনাপুরে চলে এলেন!

বুদ্ধিকৌশলে ও কূটনীতি প্রয়োগ করে দুর্যোধন তাঁর সৈন্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি করুন না কেন, সাহায্যের প্রত্যাশায় দ্বারকাপুরীতে গিয়ে তিনি বুদ্ধির খেলায় যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে সম্যক উপলব্ধি করার মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাই মূর্খের মতন সবচেয়ে বড় ক্ষতিকে সব চাইতে বড় লাভ মনে করে পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন।

অভিমন্যুর বিবাহের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের মিত্রসুলভ সমস্ত নরপতির কাছেই আগামী মহাসমরে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে দক্ষ ও বিচক্ষণ বহু দূত বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তিনি ঘনিষ্ট আত্মীয়, দুর্দিনের বান্ধব, বহুদর্শী উপদেষ্টা ও সৎ পরামর্শদাতা পাণ্ডবসখা বাসুদেবের কাছে একজন সাধারণ দূত পাঠাতে

চাইলেন না। তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের দ্বারকাপুরীতে যাওয়া স্থির করলেন। এই বিশেষ সংবাদ সকলের কাছে সংগোপন রাখার চেষ্টার কোনও ত্রুটি না ঘটলেও তা দীর্ঘকাল গোপন রইল না। অনতিবিলম্বে দুর্যোধন গুপ্তচরের মুখে সমস্ত অবগত হলেন। পাণ্ডবদের মতন তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। বসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম তাঁর গদাযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার গুরু এবং স্বয়ং জনার্দন তাঁর বৈবাহিক। তাঁর একমাত্র কন্যা রাজকুমারী লক্ষ্মণার সঙ্গে জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের বিবাহ হয়েছে। তাই অর্জুনের সেখানে যাওয়ার সংবাদ জানতে পেরে তিনিও অতি দ্রুতগামী তুরঙ্গমসমূহযুক্ত রথে আরোহণ করে দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দু'জনেই প্রায় একই সময়ে সামান্য আগেপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে উপনীত হলেন। আগে দুর্যোধন, পরে অর্জুন।

শ্রীকৃষ্ণও বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ। কোথায় কি ঘটছে, কোন্ রাজা কি করছেন এবং কে কোন্ পক্ষে যোগ দিলেন—সমস্ত সংবাদ তিনি প্রতিনিয়ত সুদক্ষ গুপ্তচরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন। দুর্যোধনের প্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে খবর জানতে পারলেন। কিন্তু অর্জুন তখনও না এসে পৌঁছনোতে তিনি অন্তঃপুররক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে কপটনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। দুর্যোধন বা অর্জুন—দু'জনে সেখানে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে গভীর নিদ্রামগ্ন দেখে ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালেন না। তিনি জাগরিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করাই উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। উভয়েই প্রার্থী হয়ে বহুদূর থেকে এসেছেন, তাই প্রার্থিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় কেউই নিদ্রায় বাধা দিয়ে অপ্রীতিভাজন হতে চাইলেন না। অতিথির প্রাপ্য পাদ্য-অর্ঘ্য-পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী দুর্যোধন উপবেশন করলেন তাঁর শিয়রে রক্ষিত অপূর্ব কারুকার্যকরা মণিমাণিক্যখচিত উচ্চ সিংহাসনে এবং সেখানে অন্য কোনও আসন না থাকায় অর্জুন বসলেন পালঙ্কে তাঁর পদপ্রান্তে বিনম্রভঙ্গিতে।

বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভন পরিত্যাগ করে চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করলেন। চোখ খুলে প্রথমেই

তিনি দেখতে পেলেন প্রিয়সখা পার্থকে, আনন্দে উঠে পিছন ফিরতেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দুর্যোধনের উপর। মৃদু হেসে তিনি দু'জনকেই স্বাগত জানালেন। তারপর কুশল প্রশ্নাদির পর বাসুদেব সহাস্যবদনে তাঁদের বললেন: তোমরা উভয়েই আমার আপনজন, নিকট আত্মীয়। তোমাদের কাছে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। একসঙ্গে দু'জনকে যে দেখতে পাব, তা ভাবি নি কোনদিন। কিন্তু তোমাদের আকস্মিকভাবে আসার কারণ এখনো জানতে পারি নি।

অর্জুনকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দুর্যোধন তাড়াতাড়ি বললেন: শ্রীকৃষ্ণ! কিছুই তোমার অজ্ঞাত নয়। তাই অহেতুক ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ খুব নিকটবর্তী। আমার ইচ্ছা, এই যুদ্ধে তুমি কৌরবপক্ষ অবলম্বন কর। এতদূরে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। অর্জুনের অনেক আগে আমি পৌঁচেছি! তুমি তো জান, ক্ষাত্রসমাজের প্রচলিত প্রথা অনুসারে সুধীব্যক্তিদের কাছে প্রথমাগত জনের দাবিই অগ্রগণ্য।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দুর্যোধন পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ উক্তির সারবত্তা অনুধাবন করে অর্জুন হতচকিত হয়ে গেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। তাঁরই ভুলে সামান্য দেরি করে আসার জন্য এই প্রতিকূলতার উদ্ভব হয়েছে। এর জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করলেন। তিনি এতদূর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে দুর্যোধনের কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলেন না। কেবল রুদ্ধশ্বাসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি পরবর্তী ঘটনার জন্য কারতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনের তাৎক্ষণিক মনের অবস্থা উপলব্ধি করে বিশেষ কৌতুক অনুভব করলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি সহসা হেসে দুর্যোধনকে বললেন: দুর্যোধন! তুমি যে প্রথমে এসেছ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চোখ মেলে প্রথম অর্জুনকে দেখেছি। তোমার প্রথম আসা যেমন সত্যি, অর্জুনকে আমার প্রথম দেখাও তেমনি সত্যি। অর্জুন বয়োকনিষ্ঠ, তাই তাকেই

আমি অগ্রাধিকার দেব। দেখ, তোমরা দু'জনেই আমার আত্মীয়। কাউকেই আমি নিরাশ করতে চাই নে। আমি ঠিক করেছি, এক পক্ষে আমি একা নিরস্ত্র হয়ে যোগদান করব ; কিন্তু কোনও কারণেই যুদ্ধ করব না। অপর পক্ষে যোগ দেবে আমার এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা, যারা প্রত্যেকেই বীর্যবত্তায় আমার বা সাত্যকির সমকক্ষ।—বল অর্জুন! তুমি কি চাও? বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে বল—একদিকে অস্ত্রহীন একক আমি, অন্যদিকে এক অক্ষৌহিণী সশস্ত্র সমযোদ্ধা নারায়ণী সেনা? নিঃসঙ্কোচে তোমার অভীপ্সা ব্যক্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় মুখ শুকিয়ে গেল দুর্যোধনের। বাসুদেব ভারতবর্ষের অন্যতম যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্হিরবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ। তাই পাণ্ডবসহায় এই ব্যক্তিটিকে ভীষণ ভয় পেতেন দুর্যোধন। তিনি যুদ্ধ করবেন না জেনে যে আনন্দ তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল, অর্জুনকে প্রথম নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ায় তা অপসৃত হল। তাঁর বদনমণ্ডলে নিদারুণ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। যে কোনও উপায়েই হোক না কেন, সৈন্যবল বৃদ্ধিই তাঁর আগমনের একমাত্র কারণ। নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে সমরনিপুণ এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাই তাঁর কাছে বেশি গ্রহণীয়। তাই তিনি ভাবলেন যে হয়তো বা অর্জুনেক নারায়ণী সেনার অধিকার দেওয়ার জন্যই বাসুদেব এই কৌশলের অবতরণা করেছেন। কিন্তু অর্জুনের চিন্তাধারা অন্যরূপ। পাণ্ডবদের পরম হিতৈষী, নিষ্কাম পরামর্শদাতা ও দুর্দিনের একমাত্র বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে তিনি যে কোনও মূল্যে আপন করে লাভ করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন : সখা! তোমাকেই আমি বরণ করে নিচ্ছি। তোমার সশস্ত্র নারায়ণী সেনার আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যাই হও না কেন, সব সময়ে আমাদের পাশে পাশে থাক—তোমার কাছে এই আমার বিনম্র প্রার্থনা!

অর্জুনের উক্তিতে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই উত্তরই ছিল তাঁর প্রত্যাশিত। তিনি অর্জুনের উত্তরের পর দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন : দুর্যোধন! আমি তো আর তোমার পক্ষে

যোগ দিতে পারব না। অর্জুন আগেই সে প্রার্থনা জানিয়েছে। তুমি এখন ইচ্ছে করলে আমার সেই নারায়ণী সেনা নিয়ে যেতে পার। এ সম্বন্ধ তোমার মত কি ?

দুর্যোধনের মনোগত ইচ্ছাও তাই ছিল। কিন্তু অযাচিতভাবে তিনি এতক্ষণ কিছু বলতে পারছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ তোমার প্রদত্ত নারায়ণী সেনা আমি সাগ্রহে গ্রহণ করছি। শ্রীকৃষ্ণ! কিছু মনে করো না। যুদ্ধের সময় নিরস্ত্র রথীর চেয়ে অস্ত্রধারী যোদ্ধারই বেশি প্রয়োজন। আমি অর্জুনের মতন নির্বোধ নই।

দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় হাসিতে শ্রীকৃষ্ণের অধর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেনঃ বেশ, ভাল কথা! তুমি কি আজকেই সৈন্যদের নিয়ে যেতে চাও ?

দুর্যোধন আর দেরি করতে চাইলেন না। পরে কি জানি, কি হয়! বিলম্বে কার্যহানি। পাছে সৈন্য আবার হাতছাড়া হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সমান্যমাত্র পানভোজনের পরই তিনি রাজকার্যের অছিলায় বিদায় চাইলেন। দুর্যোধনের বিদায় নেবার পর অর্জুন আরও অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত পরিহাসের সুরে বললেনঃ পার্থ! তোমার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা ছিল। তুমি যে এতখানি নির্বোধ, তা ভাবি নি কোনদিন। আমি নিরস্ত্র থাকব এবং যুদ্ধ করব না জেনেও আমায় গ্রহণ করলে কেন? কৌরব ও পাণ্ডবদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এক অস্ত্রহীন বন্ধুকে নিয়ে তুমি কি করবে ?

অর্জুনের মুখমণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি কর-জোড়ে শান্ত, মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ সখা! তোমাকে ভালভাবে চিনতে পেরেছি বলেই তোমাকে আপন করে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। অপরে যাই ভাবুক না কেন, আমি জানি সারা ভারতবর্ষে তুমি অনন্য, তুলনারহিত। পাণ্ডবদের বিপদে তোমার মত একজন অকৃত্রিম সুহৃদ, বিচক্ষণ কুটনীতিবদ ও প্রজ্ঞাবান পরামর্শ-দাতার একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে যুদ্ধজয় করা

যায় না। দৈহিক শক্তির চেয়ে মস্তিষ্কের ধীশক্তিই জয়লাভের জন্য বেশি প্রয়োজন। সে শক্তি তোমার আছে। তোমার বন্ধুত্ব, তোমার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর তোমার উপদেশই হোক আমাদের পথ-চলার একমাত্র পাথেয়। তুমি আমার পাশে থাকলে কৌরবদের সুবিশাল বাহিনীকে একা আমিই বিনষ্ট করতে পারি। এর জন্য আর কারো প্রয়োজন হবে না। সখা! তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। আমার রথের সারথি হবে তুমি। আমার এই বাসনাটুকু পূরণ করে তুমি তোমার সখ্যতার বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তোল।

শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হলেন অর্জুনের কথায়। তিনি কৃতার্থ হয়ে বললেনঃ বড় কঠিন বাঁধনে বাঁধলে তুমি ধনঞ্জয়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! সবাই জানুক যে তুমি আর আমি অবিচ্ছেদ্য। তোমার ভালর জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি। দেখ পার্থ! দুর্যোধন নির্বোধ বলেই আশুপ্রাপ্তিকে বড় করে দেখল, চিরন্তর ক্ষতির দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না।

অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহের পর চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে প্রেরিত পাঞ্চালনৃপতি দ্রুপদের পুরোহিত দৌত্য ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে। দ্রুপদ পুরোহিত পরম ধার্মিক, আদর্শবান কুলীন, বেদবিদ্যাপারগ ও বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ হলেও দৌত্যকার্যে তাঁর বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। যে কোনও দূতের পক্ষে যে কূটনীতিজ্ঞান, তীক্ষ্ন বিচক্ষণতা ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্যক প্রতীতি অপরিহার্য; তা তাঁর চরিত্রে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। পরন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে তাঁর কথা বলার বাচনিক চাতুর্য ছিল সম্পূর্ণ অনায়ত্ব। উদ্ভূত পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে দূতের যে অপরিসীম স্থৈর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক, তা তিনি আদৌ দিতে পারেন নি। প্রথমে তিনি হস্তিনাপুর রাজসভায় সংযতভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কৌরবদের ছলনায় ক্রুদ্ধ হয়ে

নিজের ধৈর্যকে আর বজায় রাখতে সক্ষম হন নি। তখন তিনি অত্যন্ত রূক্ষভাষায় পাণ্ডবদের পৌরুষ ও বীর্যবত্তার প্রশংসা করে কৌরবদের যারপরনাই নিন্দা করেছেন। তাঁর সৌজন্যবিহীন উক্তির তীব্রতায় কুরুবৃদ্ধ মহামতি ভীষ্ম পর্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ কুরুপাণ্ডবের সৌহাদ্র্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান করে সন্ধির যে প্রস্তাব আপনি দিয়েছেন, তা খুবই সঙ্গত ও সময়োপযোগী হয়েছে। কিন্তু আপনার ভাষা অত্যন্ত দুর্বিনীত ও মর্মঘাতী। দৌত্যকর্মে আপনাকে প্রেরণ করা যুধিষ্ঠিরের অনুচিত হয়েছে! আপনি ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হয় যথাযথ বিনয়নম্র ভাষাপ্রয়োগবিদ্যা আপনার অধিকার হয় নি। সেজন্যই তা এত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মের এই উক্তির পর আলোচনা আর বেশিদূর এগোয় নি। দ্রুপদ পুরোহিতের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন। একটা আঘাত যেমন আর একটা আঘাতের অর্থাৎ প্রত্যা-ঘাতের কারণ হয়ে ওঠে, পাণ্ডবদের দৌত্যও তেমনি অনিবার্যভাবে প্রতিদৌত্যের কারণ হয়ে উঠল। দ্রুপদ পুরোহিতের কাছে পাণ্ডবদের প্রশংসা বিশেষ করে ভীমসেন ও অর্জুনের শৌর্যবীর্যের কথা শ্রবণ করে কৌরবপতি অন্ধ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীত, ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। আসন্ন মহাযুদ্ধে কৌরবকুলের পরাজয় ও ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী তা উপলব্ধি করেই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তিনি উপপ্লব্য নগরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিশ্বাসী আমাত্য সঞ্জয়কে দূত হিসাবে নিযুক্ত করে প্রতিদৌত্যে প্রেরণ করেছেন। লোভী পুত্রদের অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণে বাধ্য করতে না পেরে তাঁদের স্বার্থ চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখতেই কূটনীতিবিদ ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রতিদৌত্যের প্রয়াস। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধি, নীতিবোধ ও মানবিকতাকে উদ্দীপ্ত করে রক্তক্ষয়ী জ্ঞাতিবিরোধ পরিহার করা। পাণ্ডবদের সমগ্র রাজ্য বিকল্পে অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, যুধিষ্ঠির বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও কৌরবদের ইচ্ছামত যে কোনও একটি গ্রাম—পাঁচ ভাইকে মাত্র পাঁচটি গ্রাম প্রদানের আশ্বাসও সঞ্জয় দিতে পারেন নি। ফলে

ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত সঞ্জয়ের প্রতিদৌত্যও স্বাভাবিক নিয়মে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্রুপদ পুরোহিতের দৌত্য ও সঞ্জয়ের প্রতিদৌত্যের অসাফল্যে পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষই মহাসমর নিকটবর্তী দেখে সৈন্য সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্ণধার মহারাজ দুর্যোধন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ, তাঁর জামাতা মথুরানৃপতি কংস, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ও তাঁর পুত্র যুবরাজ রুক্মী, চেদিশ্বর শিশুপাল প্রভৃতি সৈন্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদে অমিত শক্তিধর রাজারা বহুপূর্বেই পরলোকগমন করেছেন এবং অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডুপুত্রেরাও তের বছরের উপর রাজ্যহারা হয়ে বনবাস জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। তাই ইত্যবসরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দুর্যোধনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছিল। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাবল অশ্বত্থামা প্রভৃতি বিখ্যাত মহারথী তাঁর পক্ষ অবলম্বন করায় এবং অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণ, গান্ধারনৃপতি শকুনি, সিন্ধুশ্বর জয়দ্রথ, মদ্রাধিপতি শল্য, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা প্রভৃতি রাজারা তাঁর মিত্রশক্তির অন্তর্গত থাকায় তাঁর অপ্রতিহত অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। ছোট-বড় অনেক রাজা-মহারাজাই তাঁর আনুগত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে তার সৈন্যসংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণীতে পরিণত হল।

ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতিতে কৌরবদের অনুরূপ পাণ্ডবদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকলেও তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে এই সুদীর্ঘ চার মাস বৃথা অতিবাহিত করেন নি। আসন্ন মহাসমরে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে তাঁরা বিভিন্ন রাজা ও বিখ্যাত যোদ্ধাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন। অনেকের সাহায্য তারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ আবার তখনও এসে পেঁছিতে পারেন নি, মাঝপথ থেকেই আগমন সংবাদ জানিয়ে বিশ্বস্ত দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডবদের অন্যতম সহায় যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ। সমগ্র যাদববাহিনীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নি সত্য, কিন্তু বেশ কিছু যদু বংশীয় রাজা ও খ্যাতনামা মহাবীর তাঁদের পক্ষে যোগদান করেছেন। পট্টমহারাণী দ্রৌপদীর ও বধূ উত্তরার পিতৃভূমি বিরাট পাঞ্চালরাজ্য ও বিস্তৃত মৎস্যরাজ্যের

পরিপূর্ণ সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য তাঁরা পেয়েছেন; নাগরাজ্যের অধিপতি দুর্ধর্ষ পার্বত্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের সাহায্যার্থে উপনীত হয়েছেন; চেদি, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও সসৈন্যে আগমন করেছেন। পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা কৌরবদের তুলনায় কম হলেও একেবারে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মত নগণ্য নয়। মোট সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

বাসুদেব অযুদ্ধমান হয়ে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করলেও তাঁর অগ্রজ বলরাম কিন্তু এই মহাযুদ্ধে বরাবর নিরপেক্ষ ছিলেন। দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়েই গদাযুদ্ধ শিক্ষায় তাঁর শিষ্যত্বকে বরণ করে নিয়েছেন। দুজনের প্রতিই তাঁর সমান স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক। দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্যোধন গুরু বলরামের কাছেও তাঁর স্বপক্ষে যুদ্ধের প্রার্থনা জানান। বলরাম তাঁর অনুরোধ রাখেন নি, সুস্পষ্টভাবে বলেছেনঃ সুযোধন! আমি কোনও পক্ষেই যোগ দেব না। অভিমন্যুর বিবাহ উপলক্ষ্যে আমি মৎস্যদেশে যা বলেছি, তা অবশ্যই তুমি শুনেছ। কিন্তু সেখানে কেউই আমার কথা গ্রাহ্য করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিকে যোগ দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অন্য পক্ষে আমার যোগদান অসম্ভব। এক মুহূর্তও আমি তাঁর বিপক্ষে থাকতে পারব না। তোমাদের এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি সমান আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। যে পক্ষেরই ক্ষতি হোক না কেন, আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। তাই আমি ঠিক করেছি, তোমাদের অথবা পাণ্ডবদের কারো সহায় হয়েই আমি যুদ্ধ করব না। যুদ্ধের সময় আমি পবিত্র স্রোতস্বিনী সরস্বতীর তীরে তীর্থদর্শনে যাব মনস্থ করেছি।

বলরাম অনুজের মতন পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেবেন না এবং নিরপেক্ষ থাকবেন জেনে দুর্যোধন সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর কাছে বিশেষ প্রত্যাশা নিয়েও আসেন নি, এতদূরে এসেছেন বলেই একবার দেখা করে গেলেন। ফলে প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য কোনও বেদনা বা গ্লানি তিনি অনুভব করলেন না।

## ॥ সাত ॥

শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক প্রস্তাবে মহারাজা চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির বজ্রাহত বনস্পতির ন্যায় এতদূর বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলেন যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হলেন না। সেখানে ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, সাত্যাকি, কৃতবর্মা, দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ; তাঁদেরও বাসুদেবের এই প্রস্তাবে বিস্ময়ের অবধি রইল না। তাঁর এই প্রস্তাব সকলের কাছেই ছিল একান্ত অপ্রত্যাশিত। তিনি যে হঠাৎ উপপ্লব্য নগরে এসে এজাতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবেন, সেকথা পূর্বাহ্নে কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত হয়ে সকলেই হতচকিত হয়ে চুপ করে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে পরিস্থিতি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আর্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন : না, না জনার্দন! এ রকম সঙ্কল্প তুমি করো না। ক্ষুদ্রমতি ধার্তরাষ্ট্রদের তুমি চেন না। পৃথিবীতে এমন কোনও হীন কাজ নেই, যা তাদের অকরণীয়। মহাসমরে পারস্পরিক সংঘর্ষে অগণিত রক্তঝরা বীভৎস মৃত্যুর চেয়ে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ শান্তি ও মৈত্রীর বাতাবরণ সৃষ্টি করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সন্ধিস্থাপন করা সর্বাংশে কাম্য সন্দেহ নেই। কিন্তু যে শার্দুল রক্তের স্বাদ পেয়েছে, মদগর্বে হিংস্র হয়ে উঠেছে, আত্মম্ভরিতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করে ; তাকে তুমি প্রেম ও অহিংসার কথা বলে নিরস্ত করবে কি করে? সারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পীঠস্থান হস্তিনাপুর আর পাপিষ্ঠ দুর্যোধন তার অবিসংবাদিত নেতা। ক্ষমতার দম্ভে, শক্তির অহমিকায় ও পরদ্রব্য হস্তগত করার জঘন্য লালসায় সে আজ ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত ও দিশেহারা। যা আছে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। আরো বেশি করে পরের ঐশ্বর্য ও সম্পদ পাবার জন্য তার ব্যাগ্রতার অন্ত নেই। তোমার শুভবুদ্ধি ও সাধু প্রচেষ্টাকে সে অন্য চোখে দেখবে। হয়তো বা সুযোগ পেলে তোমার ভীষণ ক্ষতি করবে। আমি শান্তি চাই সত্যি,

ভয়াবহ যুদ্ধকে এড়াতে সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক বটে, ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্য থেকে দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাতে আগ্রহী ঠিক : কিন্তু তার জন্য তোমার কোনও বিপদ ঘটে আমার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। না কেশব, না। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।

যুধিষ্ঠিরের কথা উপস্থিত প্রায় সকলেই সমর্থন করলেও শ্রীকৃষ্ণ তা আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি একবার যা করণীয় বলে মনস্থ করেন, তা থেকে তাঁকে নিরস্ত করা অন্যের সাধ্যাতীত। এ ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : ধর্মরাজ! আপনি অকারণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাকে বাধা দিচ্ছেন। আমি শেষবারের মত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরব রাজসভায় যাব বলে যখন স্থির করেছি, তখন আর এর অন্যথা হতে দেব না। আপনারা উভয় পক্ষই আমার নিকট আত্মীয়। আত্মীয় হিসাবে সকলের জন্য জ্ঞাতিবিরোধ পরিহার করে সন্ধির চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। এ না করলে আমি চিরকাল নিন্দিত হব। আমার এই প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে সকলের কাছে প্রমানিত হবে যে মহাযুদ্ধের জন্য ধার্তরাষ্ট্রেরাই একমাত্র দায়ী। দাদা! আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। দুর্যোধনকে আমি ভাল করেই চিনি। তার নীচতাও আমার অজানা নয়। সে বা তার কুকর্মের ইন্ধনদাতা পাপিষ্ঠরা যদি আমাকে সামান্যতম বিপদে ফেলার চেষ্টা করে অথবা যদি আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে উদ্যোগী হয়, তবে আমি আপনাদের যুদ্ধ করার পূর্বেই তাদের সবংশে ধ্বংস করতে এতটুকু ইতস্তত করব না। ধর্মরাজ! আমার অনুরোধ, আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার স্বার্থের প্রতিকূলে কোনও কাজ অনুষ্ঠিত হতে আমি দেব না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রথম যুধিষ্ঠিরের কাছে অকস্মাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারলেন। অনেকেই তাঁর যুক্তি সমর্থন করলেন। যুধিষ্ঠিরের অন্তরেও তা স্পর্শ করল। তিনি আর আগের মত অসম্মতি প্রকাশের অবকাশ পেলেন না, তবু তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বললেন : মধুসূদন! আমার তো মনে হয়, তোমার

সেখানে না যাওয়াই উচিত। তোমার কথা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোমার যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধেও কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। বক্তব্য পরিষ্কার, জটিলতা বর্জিত। কিন্তু ভাই! তোমার ভালমন্দের কথা চিন্তা করেই ভয় হয়! তুমিই আমাদের প্রধান সহায়, অসময়ের বন্ধু ও বিপদে পরামর্শদাতা! তবে যাবে বলে যখন ঠিক করেছ, আমি আর বাধা দেব না। সেখানে গিয়ে সাবধানে থেকো আর সর্বপ্রকারে যুদ্ধ পরিহার করে সন্ধির চেষ্টা করো। পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, পিতৃব্য বিদুর প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধদের আমার প্রণাম জানিও আর দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ভাইদের আমার আশীর্বাদ দিও। গুরুজনদের কাছে বিনীতভাবে আমার যুদ্ধে অনিহা আর সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করো। আমি অপরের রাজ্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদ কিছুই চাই নে, কিন্তু নিজের প্রাপ্য ইন্দ্রপ্রস্ত রাজ্যও হারাতে প্রস্তুত নই। তারা যদি ইন্দ্রপ্রস্ত প্রত্যর্পণে অসম্মত হন, তবে সন্ধির সর্তস্বরূপ কুশস্হল, বৃকস্হল, মাকন্দী, বারণাবত, ও তাঁদের ইচ্ছামত যে কোনও একটি গ্রাম প্রদানের ন্যূনতম এই দাবি জানাতে ভুল না। পাঁচ ভাইকে যদি তাঁরা সামান্য পাঁচটি গ্রাম দিতেও স্বীকৃত না হন, তবে যুদ্ধ অনিবার্য। সেই যুদ্ধে ন্যায় ও ধর্মের কাছে কৌরবদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলো—আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। মাত্র পাঁচটি গ্রামের অধিকার নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই।

শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির সম্মতি দেওয়ায় কেশব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অপরিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ঃ ধর্মরাজ! আপনার নির্দেশ আমি যথাযথভাবে পালন করব। আপনার ন্যূনতম সঙ্গত দাবি বজায় রেখে যদি সন্ধি করতে পারি, তবেই তার চেষ্টায় তৎপর হব। কোনও অবস্হাতেই আপনার স্বার্থ বা সম্মান একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হতে দেব না।—এই বলে তিনি ভীমসেনকে সম্বোধন করে সরাসরি প্রশ্ন করলেন ঃ দাদা বৃকোদর! পাণ্ডব-কৌরব দ্বন্দ্বে আপনাদের পাঁচ ভাইয়ের সমস্যাই সমান। এই সন্ধি সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভীমসেন এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক এই

প্রশ্নে তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক আগ্রহ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সন্ধিস্থাপনের প্রবল ইচ্ছার কথা স্মরণ করে তিনি শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ ভাই মধুসূদন! তুমি কৌরব রাজসভায় গিয়ে যাতে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়, তার চেষ্টা করবে। কারো বীরত্বের উল্লেখ করে কৌরবদের ভয় দেখাবে না। দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনকে কোনপ্রকার কটূক্তি করো না। সান্ত্ববাদে তাঁকে সন্তুষ্ট করো। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বভাব, অপরিণামদর্শী, ঐশ্বর্যমদমত্ত, কল্যাণবিদ্বেষী, নিষ্ঠুর, পাপাত্মা ও শঠ। মহাঅভিমানী সে, মৃত্যুকে বরণ করবে, তবু কারো কাছে নতি স্বীকার করবে না। তাই কটূবাক্য প্রয়োগ করে বা ভয় প্রদর্শন করে তার কাছে কোনও কার্যই সিদ্ধ করা অসম্ভব। তুমি প্রীতিসিক্ত সৌহার্দপূর্ণ মিষ্ট কথায় তাকে সন্ধির অনুকূলে নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ হলে মহারাজা চক্রবর্তী ভরতের বংশধরদের রক্ষার আর কোনও উপায়ই থাকবে না। তোমার উপর ধর্মরাজ সেই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পরম পুজ্য জ্যেষ্ঠের মতানুযায়ী তুমি সমগ্র ভরতবংশ তথা ক্ষত্রকুলকে আসন্ন মহাসমরে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সর্বপ্রকার যত্নের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করবে।

মহাপরাক্রান্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের মুখে এই শ্রেণীর শান্তির কথা শুনে বাসুদেব যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে তীক্ষ্ম কটাক্ষ করে ব্যঙ্গমিশ্রিত মৃদুহাস্যে অধর উদ্ভাসিত করে বললেনঃ মহাবল ভীমসেন! এসব আপনি কি বলছেন? আপনার মুখের কথা শুনে আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না যে আমি কি সেই মহারৌদ্র ভীমসেনের কথা শুনছি, না কোনও ভীত প্রেতাত্মা ভীমসেনের মস্তকে ভড় করে তাঁকে দিয়ে এসব কথা বলাচ্ছেন? আপনিই না কৌরবদের সংহারমানসে দিবারাত্র যুদ্ধের প্রশংসা করে থাকেন? আপনি না তের বৎসর ন্যুব্জভাবে শয়ন করে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন? আপনিই না সধুম হুতাশনের ন্যায় স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে সন্তপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন? আপনিই না উন্মত্ত মাতঙ্গের মত বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করে ভূমিকে পদাঘাতে জর্জরিত করেন? আপনিই না উচ্চকণ্ঠে বারংবার গর্জন করে নিজের বৈরবিমর্দন

প্রতিজ্ঞাকে হোমানলের ন্যায় সর্বদা অন্তরে প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন? আপনার প্রতিশোধ চরিতার্থতার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করে অনেকেই ভীত হয়ে আপনার কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। এখন যুদ্ধ আসন্ন দেখেই কি আপনার হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক হয়েছে? আপনার এই শান্তিপূর্ণ সন্ধির আকাঙ্ক্ষা কি বংশরক্ষার চিন্তায়, না ব্যক্তিগত পরাজয়ের আশঙ্কায়?

শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় রূঢ় কথার জন্য ভীমসেন একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। কেউ যে তাঁকে এরূপ কথা বলতে পারে, তাঁর স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। তাঁর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। সাময়িক আত্মবিহ্বলতা অপসৃত হওয়ায় তিনি যেন আবার আত্মস্বরূপে ফিরে এলেন। তিনি অকস্মাৎ সহস্র বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড গর্জন করে বলে উঠলেন: শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কাকে কি বলছ, জানো না। তুমি অকারণ আমায় তিরস্কার করছ। তুমি না হয়ে অন্য কেউ হলে, তার আজ আর নিস্তার ছিল না। যুদ্ধই আমার কাম্য, বাহুবল প্রদর্শনই আমার ঈপ্সিত, শত্রুসংহারই আমার অভীপ্সা। যদি কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ কোনদিন সংঘটিত হয়, তবে সেই যুদ্ধে তুমি আমার পরিচয় পাবে। আমি ধর্মরাজের সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছাকে স্বাগত জানাতে আর পূর্বপুরুষদের ঋণ স্মরণ করে ভরতবংশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আত্মসম্বরণ করেছি। নইলে আমার বৈরনির্যাতন স্পৃহা বা দৈহিকশক্তি ও মনোবল কোনও কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি।

ভীমসেনের এরূপ রুদ্রমূর্তি দেখে সকলে আতঙ্কে ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। কি করে তাঁর ক্রোধাগ্নির উপশম ঘটাবেন, বুঝতে না পেরে তাঁরা চিন্তিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তা অনুমান করে সবাইকে আশ্বস্ত করতে এবং ভীমসেনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে রহস্যময় মৃদু হেসে বললেন: না, না দাদা! আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনার প্রবল পরাক্রম বা মানসিক অভিপ্রায় কোনটাই আমার অজানা নয়। আপনার বাহুবল বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনাকে ভর্ৎসনা করা অথবা ধিক্কার দেওয়া আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয়। আপনি নিজের ক্রোধকে সংযত করে সন্ধির প্রস্তাব সমর্থন করায় এবং অনর্থক যুদ্ধ না করে বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হওয়ায় আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীমসেন সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি আবার শান্তভাব ধারণ করলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও সন্ধির প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। তাঁর বক্তব্যে দুই অগ্রজের কথাই প্রতিধ্বনিত হল। তবু তিনি শেষদিকে সংযোজিত করলেন ঃ কেশব! তুমি প্রথমে সর্বপ্রকারে সন্ধির চেষ্টা করবে। যদি তোমার এত চেষ্টাতেও সন্ধি না হয়, তা হলে কৌরব রাজসভায় উপস্থিত সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলবে যে আসন্ন মহাযুদ্ধে কপিধ্বজ রথারূঢ় কেশবসহায় গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকেরই যথাযথ সাক্ষাৎ ঘটবে। সেই প্রচণ্ড সংগ্রামে আমার হাত থেকে তাঁদের কারো নিস্তার নেই। তাঁরা যত শক্তিরই অধিকারী হোক না কেন, তাঁদের যত বিশাল সৈন্যসংখ্যাই থাকুক না কেন এবং সমরোপকরণের যত প্রাচুর্যই ঘটুক না কেন; ধ্বংস তাঁদের অনিবার্য। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমি ক্রুদ্ধ হলে তাঁদের রক্ষা করতে পারে। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিও, ঘোষযাত্রার অপমান ও নিকট অতীতের উত্তর গোগৃহের লাঞ্ছনার স্মৃতি তাঁরা যেন বিস্মৃত না হন।

চতুর্থ পাণ্ডব মাদ্রীপুত্র নকুলও অগ্রজ কৌন্তেয়দের সন্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব অন্য মত ব্যক্ত করলেন। তিনি সন্ধির প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণ করে আবেগকম্পিতকণ্ঠে বাসুদেবকে বললেন ঃ না জনার্দন, না! আপনি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেও সন্ধির জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করবেন না। কৌরবেরা যদি সন্ধি করার জন্য লালায়িত হন, দুর্যোধন যদি নিজের অন্যায় স্বীকার করে দন্তে তৃণ ধারণ করে সানন্দে ধর্মরাজকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধেরা যদি একবাক্যে করজোরে প্রার্থনা জানান; তবু যাতে সন্ধি না হয়, আপনি সর্বপ্রকারে তার ব্যবস্থা করবেন। আমার একান্ত মিনতি, কিছুতেই সন্ধি হতে দেবেন না। কৌরব রাজসভায় পট্টমহারাণী রজস্বলা দ্রৌপদীর নারীত্বের চরমতম লাঞ্ছনা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিকতার আবরণে নিজেকে আবৃত করে ভুলে থাকতে পারেন, বৈরনির্যাতনে ভীম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের তা বিস্মরণ ঘটতে পারে, আপনার প্রিয়সখা অপরাজেয় গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সেই কলঙ্কপঙ্কিল বেদনাতুর

দিনের কথা স্মৃতিপঠে না জাগতে পারে, জ্যেষ্ঠানুগত্যের আধিক্যে সহোদর নকুলের তা মনের অতলে তলিয়ে যেতে পারে ; আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনি সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দিনের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাবেন না। দর্পহারী অরাতিনিসূদন মধুসূদন ! আপনি বহুবার দুর্বিনীত শত্রুর দর্প বিনষ্ট করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, মদগর্বী ধার্তরাষ্ট্রদেরও তেমনি আসন্ন মহাসমরে ধ্বংস করতে তৎপর হন।

সহদেবের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তিতে সমবেত মহারথীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা প্রবল হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। উগ্রস্বভাব যুদ্ধপ্রিয় যাদবপ্রধান সাত্যকি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব ! মহামতি সহদেব যা বলেছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করি। যতদিন পর্যন্ত ধরিত্রী পাপিষ্ঠ ধার্তরাষ্ট্রদের উষ্মরক্তে আর্দ্র হয়ে না ওঠে, ভীমসেনের ওষ্ঠাধর দুঃশাসনের রক্তপানে রঞ্জিত না হয়, লাঞ্ছিতা মহাসতী যাজ্ঞসেনীর বদনে হাসি দেখা না দেয় ; ততদিন পর্যন্ত আমরা কেউই স্বস্তিতে বসবাস করতে পারব না। ততদিন আমাদের অন্তরে অহর্নিশ জ্বলবে অশান্তির দাবানল, বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হবে ভীষণ দুঃস্বপ্নে এবং সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথ্বী বা চন্দ্রকিরণধৌত মহীকে মনে হবে ঘোর তমসাবৃতা। তাই সন্ধি নয়, যুদ্ধই সকলের একমাত্র কাম্য।

সহদেব ও সাত্যকির কথায় অন্তরে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তিনি চিরদুর্জ্ঞেয়। তাঁর অধরে অন্তরের বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মৃদুহাস্যে দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করলেন ঃ প্রিয়সখি ! তুমি কিছু বলবে না ? তোমার মত এখন জানতে পারি নি ?

এতক্ষণ পাণ্ডবদের মৈত্রীসুলভ সন্ধির আলোচনায় কৌরব নির্যাতিতা দ্রৌপদীর হৃদয় অতিরিক্ত দুঃখে ও গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। যাতে না মনের ভার মুখে প্রকাশিত হয়, তার জন্য তিনি সচেতনভাবে লজ্জানম্র মুখমণ্ডল সর্বক্ষণ আবৃত করে ছিলেন। সহদেব ও সাত্যকির উক্তিতে তাঁর বেদনার্দ্র মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থা তখনও হয় নি। তাই সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি শান্তকণ্ঠে সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সখা ! হস্তিনাপুরে পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের রাজসভায় সন্ধির জন্য পাণ্ডবদের হয়ে ভিক্ষা জানাতে তুমি কি এখুনি যাত্রা করবে ?

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন ঃ না সখি ! আজ যাব না। এখন কার্তিক মাস চলেছে, দৌত্যের পক্ষে এই মাসটা খুবই উপযোগী। এই মাসেরই রোহিণী নক্ষত্রে ঊষালগ্নে যাত্রা করব বলে ঠিক করেছি। গণনা করে দেখেছি, ঐ সময়টাই যাত্রার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। কিন্তু কৃষ্ণা ! তোমার মত তো বললে না ?

কোনও কথা বলার পূর্বেই দ্রৌপদীর অধর ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত সংযত ও শান্তভাবে বলে উঠলেন ঃ মাধব ! আমি আর তোমায় কি বলব ! তুমি তো সবই জান, কোনও কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ঘুমন্ত লোককে জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে ঘুমোয়—তাকে জাগরিত করা আমার সাধ্যাতীত। তাই সমস্ত জেনেও যদি তুমি না জানার ভান করো, তবে তোমায় কেমন করে জানাব ? গোকুলেশ্বর ! অসম সন্ধির প্রস্তাবক হিসাবে তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। ধর্মের আবরণে আবৃত সন্ধির সমর্থক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শত শত নমস্কার জানাই। শান্তিপ্রিয় যুদ্ধভীত মহাবল মধ্যম পাণ্ডবকেও বার বার নমস্কার করি। তৃতীয় পাণ্ডব তোমার একান্ত আপনজন, প্রিয়সখা। নমস্কার বা তিরস্কার—দুই'ই তাঁর সমান। তাঁর কাছে এদের পৃথক কোনও মূল্য নেই। চতুর্থজন বয়স্ক হলেও ছোট বলে বালকসুলভ মনোভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে নি। তাই অগ্রজদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির বশে অনিচ্ছা সত্বেও সন্ধির প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছে। যদি স্পষ্টবাদী কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব সর্বজন-সমক্ষে দৃপ্তকণ্ঠে সন্ধির বিরোধিতা না করত, যদি মহামতি সাত্যকি বিবেকের তাড়নায় তাকে সমর্থন না করতেন এবং সমবেত বীরবৃন্দ যদি তাঁর কথায় হর্ষপ্রকাশ না করতেন ; তবে পাণ্ডবদের অক্ষাত্রিয়োচিত স্তাবকতায় আমার বাক্‌শক্তি আর স্ফুরিত না হয়ে চিরদিনের জন্য রহিত হয়ে যেত।

মাত্রাতিরিক্ত হৃদয়াবেগে দ্রৌপদী আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর

নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল, বক্ষস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হতে লাগল এবং আঁখিপল্লব অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর কণ্ঠে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ কল্যাণি! তোমার মনোভাব আমার অজ্ঞাত নয়। তুমি সাময়িক উত্তেজনায় মুখে তা প্রকাশ করতে না পারলেও আমি সব জানি। সখি! আমার মিনতি, তুমি অকারণ বিচলিত হয়ো না। কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে আর রাজনৈতিক প্রয়োজনেই আমি হস্তিনাপুরে যেতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে যাবার ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার একেবারেই ছিল না। সে সব কথা তোমায় বলতে পারব না আর তা বলাও রাজনীতির পরিপন্থী। শুধু এইটুকুই জেনে রাখ যে আমি শত চেষ্টা করলেও সন্ধি হবে না; শতধাবিভক্ত রাজনৈতিক জীবনের আবর্তে মিলনমধুর ঐক্যবোধ গড়ে তোলা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরস্পর বিবদমান কৌরবদের ও পাণ্ডবদের মধ্যে মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। পাণ্ডব কুললক্ষ্মি! তুমি প্রসন্নচিত্তে আমায় যাত্রার অনুমতি দাও!

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের অকপটভ্যষণে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর গর্বোন্নত মস্তকে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন ঃ পার্থসখা! বেশ, তুমি যাও! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! আমি তোমার যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করে তা পিচ্ছিল করে দেব না। তবে যাবার আগে শুনে যাও—নির্যাতিতা রমণীর চোখের জলের যদি কোনও মূল্য থাকে, পুরুষশাসিত সমাজজীবনে নারীত্বের চরমতম অবমাননা যদি উপেক্ষিত হয়, মানবিকতার ঘোরতর দুর্দিনে অবলা কামিনীর পরম লাঞ্ছনায় স্বার্থের খাতিরে পুরুষজাতি যদি আত্মতৃপ্তি লাভ করে উল্লসিত হয়ে ওঠে; তবু সেই নিগৃহীতা নারীর মাতৃত্বকে কোনদিন অপমানিত করে ধূলায় লুণ্ঠিত করা যাবে না। বীরাগ্রগণ্য পঞ্চ পাণ্ডব কৌরবদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে পরম সুখ অনুভব করতে পারেন, বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখী কৃষ্ণার শালীনতা হরণকারীদের দুষ্ট প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতে পারেন, সমবেত রথীবৃন্দ নির্বাক দর্শকের মতন দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের কোনও ক্ষতি হয় নি ভেবে আনন্দিত হতে পারেন; কিন্তু আমার বীরপুত্রেরা প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বজনসমক্ষে মায়ের সেই অপমান এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হবে না! পাণ্ডবেরা যদি অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধিও করে; তবে অভিমন্যু, ঘটৎকচ,

ইরাবান, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন, যৌধেয়, সর্বগ, সর্বগত, নিরমিত্র, সুহোত্র প্রভৃতি বীরপুত্রদের নিয়ে আমি একাকী রণক্ষেত্রে গমন করব। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে তারা এতটুকু দ্বিধা করবে না। পাণ্ডবসখা! গগনচুম্বী শান্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এবার তুমি কৌবব রাজসভায় যেতে পার!

আবেগাশ্রুজলে ভারাক্রান্ত হয়ে দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল, তিনি আর কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর তেজস্বিতাপূর্ণ ভাষণে উপস্থিত বীরবৃন্দ বিচলিত হয়ে উঠলেন। অভিমন্যু আর স্থির থাকতে পারল না। প্রবল উত্তেজনায় সে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে বলল: তাই হবে বড় মা! তাই হবে! তুমি আর চোখের জল ফেল না। তোমার লাঞ্ছনা দেবার উপযুক্ত প্রতিফল কৌরবেরা পাবে। আমাদের জননীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ আমরা নেব। আসন্ন মহাযুদ্ধে পাণ্ডব বংশধরদের বীর্যবত্তার সম্যক পরিচয় তারা লাভ করবে। তোমার মতন যুদ্ধ আমাদেরও কাম্য।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ চুপ করে সব লক্ষ্য করছিলেন। বর্তমান ঘটনা-প্রবাহকে তিনি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে দিতে চাইলেন না। তাই সবাইকে সংযত করতে তিনি মৃদুহাস্যে শান্তকণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে বললেন: তোমার কাম্য হলেও যুদ্ধ আমার কাম্য নয় অভিমন্যু! আমি যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধ চান না, শান্তি চান। তোমার জ্যোষ্ঠতাত ভীমসেন যুদ্ধপ্রিয় হয়েও একটু আগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন, তোমার পিতাও সর্বান্তঃকরণে সন্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। বৎস অভিমন্যু! মনে রেখো, চাইলেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। আমরা অনেক কিছুই চাইতে পারি, কিন্তু তা যে পাব তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমরা চাইছি বলেই সন্ধি হবে, এ কথা তো জোর করে বলা যায় না। এরই নাম রাজনীতি! তাই ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হও। অনর্থক উত্তেজনা প্রশমিত কর।—ধর্মরাজ! হস্তিনাপুরে আমার যাত্রা সম্বন্ধে আমার একটি আবেদন আছে। আমার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার জন্য দেহরক্ষী, পার্শ্বচর ও দাসদাসী হিসাবে কেবলমাত্র যাদবেরাই সেখানে যাবে ঠিক করেছি; অন্য দেশের কাউকেই আমি সঙ্গে

নেব না। আমার অনুরোধ, একথা বলার কারণ জানতে চাইবেন না। আমার আর একটি নিবেদন আছে। আপনাদের বংশধরদের মধ্যে অভিমন্যুরই শুধু বিবাহ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন সুদূর হস্তিনাপুরে থাকায় অনেকেরই আশীর্বাদ থেকে নবদম্পতি বঞ্চিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমি কৌলিকপ্রথা অনুসারে গুরুজনদের প্রার্থিত আশীর্বাদ কামনায় তাদেরও সেখানে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছি। ভাগিনেয় অভিমন্যু বা বধূমাতা উত্তরার জন্য আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। সমস্ত দায়িত্ব আমার!—বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি! তুমি কাল রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম কক্ষে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। বিশেষ প্রয়োজন আছে।—সমবেত বীরবৃন্দ! আপনাদের সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে সকলের অনুমতি নিয়েই আমি স্থানত্যাগ করছি।

শ্রীকৃষ্ণ অপর কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন!

## ॥ আট ॥

মহারাজা দ্রুপদের পুরোহিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে হস্তিনাপুরের রাজসভায় আসার পর থেকেই অন্ধ বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। তাঁর অন্তরের সমস্ত সুখ ও শান্তি যেন এক মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়েছে। লোভী পুত্রদের পার্থিব স্বার্থ চিন্তা করে একদিকে যেমন তাঁর পাণ্ডবদের ন্যায়ত প্রাপ্য রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সমেত অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণের এতটুকু সদিচ্ছা নেই, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সমগ্র চিত্ত ধর্মরাজের ক্রোধের আশাঙ্কায় এবং মহাবল ভীমসেন ও ধনুর্ধর অর্জুনের জিঘাংসাপূর্ণ পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠেছে। পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে পুত্রদের বিপদের সম্ভাবনা দূর করতে সন্ধিবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক শান্তিতে বসবাস করায় তাঁর অনীহা নেই বটে, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ার লব্ধ রাজ্য তিনি আবার ফিরিয়ে দিতে

চান না। এর পরিণাম যে কখনও শুভ হতে পারে না, এর ফলে যে চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং এর পরিণতি যে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ; সে সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত কিছু জেনেশুনেও উদ্ভূত সমস্যার যুক্তিসম্মত সুষ্ঠু সমাধানে তিনি সর্বতোভাবে অপারগ। এই দোলাচল মানসিকতাই তাঁর হৃদয়ের ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

ধৃতরাষ্ট্রের মহাপরাক্রান্ত ভীমাজ্জুনের অপরিসীম শৌর্য ও বীর্য-বত্তায় ভয়ের অবধি নেই সত্য, তবু তাঁদের থেকেও তাঁর বেশি ভয় ধর্ম-প্রাণ ধর্মরাজের ক্রোধকে। অপরাজেয় শক্তিধরের শক্তিকে কূটনীতি ও ছলনার সাহায্যে বশীভূত করা যায়, কিন্তু স্থিরচিত্ত ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হলে তা আয়ত্বে আনা সকলের সাধ্যাতীত। তিনি একথা ভাল করেই জানেন যে ধর্ম বিক্ষুব্ধ হলে নিষ্কৃতিলাভ করা সুদূরপরাহত, আকাশকুসুম কল্পনামাত্র। তাই অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েই তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মরাজকে প্রত্যেক্ষ সংগ্রাম থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে বিশ্বাসী অমাত্যে সঞ্জয়কে প্রতিদৌত্যে নিযুক্ত করে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপপ্লব্য নগরে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সেই প্রতিদৌত্যও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিফল মনোরথ হয়ে সঞ্জয় সন্ধ্যাকালে হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছেন। পথ-পরিক্রমায় অতিরিক্ত ক্লান্ত হবার জন্য তিনি প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা বলতে পারেন নি, পরের দিন প্রাতঃকালে রাজসভায় তিনি নিবেদন করবেন জানিয়েছেন।

সঞ্জয়ের কাছ থেকে সেখানকায় সমস্ত কথা জানা সম্ভবপর না হলেও তিনি যেটুকু বলেছেন, সর্বোপরি তাঁর দৌত্যের অসাফল্য অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলল। সারারাত নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তিনি শয্যাগ্রহণ করতে পারলেন না। মানসিক অবসাদ বিদূরিত করতে তিনি অমাত্য বিদুরকে তাঁর প্রাসাদে আহ্বান করে নানা-রূপ আলাপ-আলোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি সকলে রাজসভায় সমবেত হলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র রত্নখচিত সুউচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করলে মহামতি ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাবীর অশ্বত্থামা, মহারাজা দুর্যোধন, রাজভ্রাতা দুঃশাসন, মহারথী

কর্ণ, গান্ধারনৃপতি শকুনি, অমাত্য সঞ্জয়, ধর্মাত্মা বিদুর ও অন্যান্য সভাসদবৃন্দ, মিত্ররাজন্যবর্গ, বয়স্ক পুরবাসিগণ এবং মুনিঋষি ও ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করলেন। মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করে বললেনঃ ভরতশ্রেষ্ঠ! কুরুকুল অধিপতি! আপনি লুব্ধ পুত্রদের সংযত না করে তাঁদের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের ধর্মত প্রাপ্য অর্ধেক রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তা অনন্তকাল ধরে উপভোগ করতে চাইছেন। এতে সমগ্র ভারতবর্ষে আপনার অপযশ কীর্তিত হচ্ছে। আপনার দোষেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হতে চলেছে। আপনি যদি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন, তবে বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ের হাত থেকে কৌরবদের নিস্তার নেই। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণরাজি ও বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে, তিনিও তেমনি প্রলয়ঙ্কর মহাসমরে সমগ্র কৌরবকুলকে বিনষ্ট করবেন। আপনি এখন আপনার প্রতি বিশ্বস্ত ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করে অবিশ্বস্ত ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের কথায় চলেছেন। কিন্তু একটা কথা সব সময়েই মনে রাখবেন, আপনার এমন কোনও শক্তি নেই যে পাণ্ডবদের পরাজিত করে এই রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। তাই বার বার আপনার মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করছি, পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করুন।

ধর্মাত্মা বিদুরও সঞ্জয়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে বললেনঃ অমাত্য সঞ্জয় এই ঘোর সংকটকালে পরিত্রাণের উপযুক্ত পরামর্শই আপনাকে দিয়েছেন। আপনি তাঁর কথাকে উপেক্ষা করবেন না। মহারাজ! একবার বিবেচনা করে দেখুন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্বপ্রকার রাজোচিত লক্ষণযুক্ত হলেও আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন বলেই কপট অক্ষক্রীড়ার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বনবাসে গিয়েছেন। আপনি ধর্মজ্ঞ ও কূটনীতিবিদ হলেও জন্মান্ধ। তাই রাজ্যলাভের কোনও যোগ্যতা আপনার নেই। মদগর্বী দুর্যোধন, হীনচেতা দুঃশাসন, কুচক্রী শকুনি ও আত্মম্ভরি কর্ণকে রাজ্যমধ্যে প্রাধান্য অর্পণ করে আপনি কেমন করে শ্রেয়োলাভের প্রত্যাশা করেন? এখনও সময় রয়েছে। আপনি পাণ্ডব-দের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন। এর ফলে আপনার বর্তমান অখ্যাতি

দূরীভূত হবে এবং আপনি অবশিষ্ট জীবন পুত্রদের নিয়ে সুখে বসবাস করতে পারবেন।

কুরুবৃদ্ধ মহামতি ভীষ্মও তাঁদের কথা সমর্থন করে বলতে লাগলেন ঃ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! সঞ্জয় আর বিদুর খুব সঙ্গত প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে কৌরববংশকে তুমি আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ চির অপরাজেয়, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না। দুর্যোধনের বুদ্ধি ধর্ম ও অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক কদর্য পঙ্কিল পথ অবলম্বন করেছে। পাপবুদ্ধি দুঃশাসন, কূটকৌশলী সুবলনন্দন শকুনি আর নিকৃষ্টবংশজাত সূতপুত্র কর্ণের প্রভাবে সে সেই পঙ্কিল পথকেই কুসুমাস্তীর্ণ মনোরম বলে মনে করছে। এভাবে চললে তাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ করতে পারবে না। হীনচেতা নীচ কর্ণের বাহুবলের উপরেই তোমার পুত্রের ভরসা বেশি, যার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে একদা পরমারাধ্য অস্ত্রগুরু মহর্ষি পরশুরাম তাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

ভীষ্মের উক্তিতে শ্লেষের তীব্রতায় মহাবীর কর্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তবু রাজসভার যথোচিত মর্যাদা বজায় রেখে তিনি সংযতভাবে উত্তর দিলেন ঃ পিতামহ! আপনি অহেতুক সকলের সামনে আমায় ভর্ৎসনা করছেন। আমি আশৈশব ক্ষাত্রধর্ম পালন করে এসেছি। কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমি সেই ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হই নি। আমি এমন কি দুষ্কর্ম করেছি যে আপনি আমার নিন্দা করতে পারেন? —মহারাজ! একদা যাঁদের সঙ্গে একবার বিরোধ ঘটেছে, কোনও অবস্থাতেই আর তাঁদের সঙ্গে সন্ধি হতে পারে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অপরের সাহায্য ব্যতীতই সম্মুখ সমরে আমি একাকী পাণ্ডবদের বধ করব।

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কর্ণের উক্তিতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন ঃ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এই অর্বাচীন দুর্মতি সূতপুত্রের আত্মম্ভরিতার জন্যই তোমার দুরাত্মা পুত্রদের বিপদ দেখা দেবে। এখন কর্ণ মহাবৃষের ন্যায় রাজসভায় আস্ফালন ও লম্ফঝম্প করছে। তাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, একবার নয়, দু'বার নয়,

তিন তিনবার সে রণস্থলে অর্জুনের মুখোমুখি হয়েছে—প্রথমবার পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, দ্বিতীয়বার দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় এবং তৃতীয়বার মৎস্যরাজ্যে উত্তর গোগৃহে। সে সময় তার এই বীরত্ব কোথায় ছিল?

ভীষ্মের এই জাতীয় কটূক্তির জন্য কর্ণ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। অকস্মাৎ এই মর্মান্তিক উক্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠল, প্রবল উত্তেজনায় বক্ষস্থল আন্দোলিত হতে লাগল এবং নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রবাহিত হল। অতি কষ্টে তিনি আত্মদমন করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন: মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম বার বার আমার প্রতি এমন সব উক্তি করছেন, যা আদৌ সঙ্গত নয়। তিনি যদি বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তি না হতেন আর এটা যদি রাজসভা না হত, তাহলে এখনি এর উচিত শিক্ষা দিতাম। স্থান আর পাত্র বিবেচনা করেই তা থেকে বিরত রইলাম। তবে আমার পরাক্রমে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি যে প্রশ্ন সকলের সামনে উত্থাপন করেছেন, এক এক করে আমি তার উত্তর দিচ্ছি। শুনুন মহারাজ! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে আমার তিনবার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেই সব যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য আমি দায়ী নই। অর্জুনের ভাগ্যই তাকে বিজয়ীর মুকুট পরিয়েছে। পাঞ্চালরাজ্যে স্বয়ম্বর সভায় সমবেত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী ভীমার্জুনের যখন যুদ্ধ হয়, তখন পাঞ্চালীর মর্মন্তুদ উক্তি 'সূতপুত্রকে কখনও বরণ করব না' শুনে আমার এতদূর চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল যে আমি যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলাম। দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ দৈহিকশক্তির অহঙ্কারে কৌরব নরনারীদের বন্দী করলে আমি সবেমাত্র গুরুপ্রদত্ত অব্যর্থ শব্দভেদী বাণে গন্ধর্বদের সংহার করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় তাঁদের জয়োল্লাস ছাপিয়ে কৌরবরমণীদের আর্তকণ্ঠস্বর বনভূমিকে মুখর করে তুলল। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় আমি হতচকিত হয়ে জ্যাবদ্ধ সেই ভয়ঙ্কর শরকে জ্যামুক্ত করতে বাধ্য হলাম। সেই শর প্রয়োগ করলে গন্ধর্বকুল বিনষ্ট হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কৌরব পুরনারীদের রক্তে ধরিত্রী আর্দ্র হয়ে উঠত। আর মৎস্যরাজ্যে উত্তর গোগৃহে যুদ্ধ? মহারাজ! সে যুদ্ধের কথা স্মরণ করলে আমি আজও হাস্য সংবরণ করতে পারি

নে। রমণীর ছদ্মবেশে অর্জুন সেদিন যুদ্ধ করতে এসেছিল। বেশ-ভূষায় এতটুকু ত্রুটি কোথাও নেই। অঙ্গসজ্জা এতখানি সার্থক হয়েছিল, যে দূর থেকে বোঝার উপায় ছিল না সে পুরুষ কিংবা মহিলা। পুরুষে পুরুষে দ্বৈরথ যুদ্ধ শোভা পায়, কিন্তু নারীর সঙ্গে যুদ্ধ? সে বোধ হয় পিতামহেরও ঈপ্সিত নয়! রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ মনে করেই আমি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করি। বলুন মহারাজ! এতে আমার বীরত্বের ন্যূনতা কোথায় প্রকাশ পেয়েছে?

দুর্যোধন এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনেছেন। তিনি কারো কথার কোনও প্রতিবাদ করেন নি। সঞ্জয়, বিদুর ও ভীষ্মের পাণ্ডব-প্রশস্তিতে, বিশেষ করে ভীষ্ম প্রাণপ্রিয়বন্ধু কর্ণকে অকারণ তিরস্কার ও নিন্দা করায়, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও কৃপাচার্য প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধদের অপেক্ষা মহাবীর কর্ণের বাহুবলের উপরেই তিনি বেশি আস্থাবান। কৌরবদের মতন পাণ্ডবেরাও তাঁদের পরম স্নেহের পাত্র। তাই রণক্ষেত্রে তাঁরা যে ঠিক-ভাবে যুদ্ধ করবেন, এ ভরসা তাঁর একেবারেই ছিল না। কিন্তু মহাধনুর্ধর কর্ণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর অপরিসীম বীরত্বের ন্যায় পাণ্ডববিদ্বেষও সর্বজনবিদিত। বস্তুত কর্ণের অনন্যসাধারণ বীর্যবত্তার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে সেই কর্ণের বেদনাময় উক্তিতে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন: সখা! ক্ষান্ত হও! পরের কথায় অহেতুক এই উত্তেজনা তোমার শোভা পায় না। তোমার বীরত্ব কারো অজানা নয়। আমি কি কোনদিন তাতে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেছি? তবে কেন তুমি দুঃখ করছ?

দুর্যোধনের হৃদ্যতাপূর্ণ বাক্যে কর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করলেন। তখন মহামতি দ্রোণাচার্য বললেন: মহারাজ! বীর-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কৌরবদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অহঙ্কারী ব্যক্তিদের কথা না শুনে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেই অনুসারে চলুন। আমারও মনে হয়, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধি করাই মঙ্গল। তাতে পাণ্ডবদের থেকে কৌরবেরাই বেশি লাভবান

করবেন। আমার প্রিয়শিষ্য বলে অর্জুনের অকারণ প্রশংসা করছি না। মনে রাখবেন, ধনঞ্জয়ের তুল্য ধনুর্বিদ সমগ্র ভারতবর্ষে নেই।

কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য সঞ্জয়, ধর্মাত্মা বিদুর, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণের সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না. সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না; সে সময় আসন্ন মহাযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের চিন্তা তাঁর সমস্ত অন্তরকে জুড়ে ছিল। তিনি সেই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেনঃ সঞ্জয়! যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সমাবেশ কি রকম দেখলে? তার পক্ষে কারা কারা যোগদান করেছেন? আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী দক্ষ শক্তিশালী সৈন্য সংগ্রহের কথা শুনে সে কি বললে?

সঞ্জয় কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সরাসরি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দিলেনঃ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যাঁরা যোগদান করেছেন, সবাই অতুলনীয় শক্তির অধিকারী। পঞ্চ পাণ্ডবের বীর্যবত্তার পরিচয় আপনার অজ্ঞাত নয়। নতুন করে তাঁদের শক্তির কি পরিচয় আপনাকে দেব? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিধর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে পরাভূত করার পৌরুষ কারো নেই, শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ গাণ্ডীবধন্বা তৃতীয় পাণ্ডব সব্যসাচীর তুল্য ধনুর্ধর কাউকেই দেখতে পাই নে, অন্যান্য পাণ্ডবেরা শক্তিতে ও সাহসে কেউই কম যান না। পাঁচ ভাই একত্রিত হয়ে ইচ্ছা করলে যে কোনও রাজ্যকেই অনায়াসে পরাভূত করতে পারেন। এঁরা তো রয়েছেনই, তার উপর এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিস্তৃত পাঞ্চাল ও মৎস্যরাজ্যের সমগ্র বাহিনী। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি তাঁর আঠেরজন পুত্রের প্রত্যেকেই মহারথী। মৎস্যরাজ বিরাটও একজন পরাক্রান্ত মহারথী। শতানীক, সূর্যদত্ত, শ্রুতানীক প্রভৃতি তাঁর দশজন ভাই এবং শঙ্খ, উত্তর ও শ্বেত তিনজন পুত্রই মহারথ। এঁরা ব্যতীত বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, মহাবল কাশী-রাজ, চেদিপতি মহাশক্তিশালী ধৃষ্টকেতু ও তাঁর ভাই শরভ, মগধাধিপতি সহদেব ও তাঁর ভাই জয়ৎসেন, কেকয়রাজের মহাশক্তিধর পাঁচ পুত্র, নাগরাজ কৌরব্যের বিশাল পার্বত্য সৈন্য প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের বংশধরেরাও পরাক্রমে পাণ্ডবদের থেকে কম নয়। পট্টমহারাণী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অসীম শক্তির অধিকারী, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু মাতুল শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বলবান ও পিতার ন্যায় ধনুর্ধর,

ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ কেবল পিতার মত শক্তিধরই নয় মায়াযুদ্ধেও বিশেষ নিপুণ, যৌধেয়, সর্বগ, সুর্গত, ইরাবান, নিরমিত্র, সুহোত্র প্রভৃতি পুত্রেরাও বাহুবলে খ্যাতি অর্জন করেছে। মহারাজ! এঁদের সকলের উপরে রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব— যাঁর বাহুবল ও বুদ্ধিবল দুই-ই বর্তমান ভারতবর্ষে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। বৃষ্ণিকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের সহায়, তাঁদের জয় অনিবার্য। আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের মিলিত রোষানলে মুহূর্তে দগ্ধ হবে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সৈন্য সমাবেশ বিশেষ করে ভীমসেন ও অর্জুনের প্রবল পরাক্রমের কথা নতুন করে শুনে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি পুত্রদের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিলাপ করতে লাগলেন ঃ সঞ্জয়! আমি মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকেই সবচেয়ে ভয় করি। সে কাউকে ক্ষমা করতে জানে না। শত্রুর শত্রুতাকে কোনদিন বিস্মৃত হয় না, পরিহাসের সময়েও মুখে হাসি দেখা যায় না, সর্বদা তীর্যক ভঙ্গিতে সবাইকে দৃষ্টিপাত করে। উদ্ধতস্বভাব অস্পষ্টবাক বহুভোজী সেই মহারৌদ্র ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার স্নেহধন্য শতপুত্রকে গদাঘাতে হত্যা করবে। সঞ্জয়! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকেও আমার ভয় কম নয়। আমি শুনেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন আর তার গাণ্ডীব ধনু—এই তিনটি শক্তি রণক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে সমগ্র কৌরববাহিনী ধ্বংস করবে। সঞ্জয়! আমি বুঝতে পারছি, পাণ্ডবেরা বিজয়ী হবে। কিন্তু সব জেনেও পুত্রদের যুদ্ধ থেকে আমি নিবৃত্ত করতে পারছি না। কারণ এক্ষেত্রে মানুষের ভাগ্যই সর্বাপেক্ষা বলবান। ভাই বিদুর! পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার সমীচীন বোধ হচ্ছে না. পরস্পর সন্ধি করে যুদ্ধ পরিহার করাই শ্রেয়। কৌরবগণ! আপনারা ভাল করে বিবেচনা করে দেখুন। যদি আপনারা সকলে সম্মত হন, তবে আমি সন্ধির চেষ্টা করি।

ধৃতরাষ্ট্রের এরূপ বিলাপে দুর্যোধনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। পাছে পিতা ভীত হয়ে সন্ধি করতে উদ্যোগী হন, এই ভয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে লাগলেন ঃ মহারাজ! আপনি অহেতুক ভয় পাচ্ছেন। আজ যাঁরা যুদ্ধে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, পাণ্ডবদের বনবাসে

যাত্রার সময়েও তাঁরা তাঁদেরই সমর্থন করেছেন। সে সময় যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মগধরাজ সহদেব, পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ ও অন্যান্য বহু রাজাই ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে এসে আমাদের নিন্দা করেছেন। এমন কি, তাঁরা যুদ্ধ করবেন বলেও শাসিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ করতে সাহস করেন নি। সে সময়ে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল ছিল না; প্রজারা আর মিত্ররাজারাও আমাদের পক্ষে ছিল না, সকলেই আমাদের ধিক্কার দিচ্ছিল। তখন যুদ্ধ হলে হয়তো বা অন্য ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু সে সময়েও পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমাদের জয় সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। মহারাজ! আজকের অবস্থা অন্য রকম। সেদিনের তুলনায় পাণ্ডবেরা এখন বহুলাংশে শক্তি-হীন। প্রজারা এখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশীভূত এবং অন্যান্য রাজ্যের উপর আমাদের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় মিত্রশক্তি বর্ধিত হয়েছে। আমাদের অগণিত সৈন্যসমাবেশ দেখে ভীত, ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে যুধিষ্ঠির অর্ধরাজ্যের দাবি, এমন কি রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের দাবিও পরিত্যাগ করে অমাত্য সঞ্জয়ের কাছে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও আমাদের ইচ্ছামত যে কোনও একটি গ্রাম প্রার্থনা করেছেন। মহারাজ! বৃকোদরের শক্তি সম্বন্ধেও আপনার ধারণা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের কাছে আমি আর ভীমসেন যখন গদাযুদ্ধ শিক্ষা করতাম, তখন সবাইকেই বলতে শুনেছি যে গদাযুদ্ধে আমার সমকক্ষ বীর কেউ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি গদার এক আঘাতে মুহূর্তমধ্যেই তাকে বধ করব। মহারাজ! বিবেচনা করে দেখুন, আমাদের পক্ষে রয়েছেন চির অপরাজেয় ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাবল অশ্বত্থামা, মহারথী কর্ণ, মহারথী ভূরিশ্রবা, মদ্রাধিপতি শল্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্ত ও সিন্ধুনৃপতি জয়দ্রথ। এঁরা যে কেউ ইচ্ছা করলেই পাণ্ডবদের বিনাশ করতে সক্ষম। এঁদের সম্মিলিত শক্তির কাছে পাণ্ডবেরা ক্ষণমধ্যেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে। তার উপর আমাদের সৈন্য সংখ্যা বেশি, আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য আর পাণ্ডবদের মাত্র সাত। আমাদের শক্তির সঙ্গে বিপক্ষের শক্তির কোনপ্রকার তুলনাই হতে পারে না।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এ জাতীয় অহঙ্কারোক্তিতে চিন্তিত হলেন। তিনি এখন কি করবেন, বুঝতে পারলেন না। তিনি 'হায় হায়' করে উঠলেন। তিনি বললেনঃ জ্যেষ্ঠতাত! দেখুন, দেখুন, আমার পুত্র পাগলের মত প্রলাপ বকছে। সঞ্জয়! বিদুর! তোমরা সকলে মিলে ওকে বোঝাও। এ কখনও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করতে পারবে না। পাণ্ডবদের শক্তি জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য সম্যক জানেন বলেই এই যুদ্ধে তাঁদের রুচি নেই। বৎস দুর্যোধন! অকারণ আত্মশ্লাঘা করে কৌরবকুলের বিপদ ডেকে এনো না। যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হও। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দাও। তাদের সঙ্গে সন্ধি কর। তোমাদের সকলের ভালভাবে জীবনধারণের জন্য অর্ধেক রাজত্বই যথেষ্ট যুদ্ধে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই; মহামতি ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, ধর্মাত্মা বিদুর, কৃপাচার্য প্রভৃতিরও তাই।

দুর্যোধন ইতিপূর্বেই ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এখন ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দম্ভ করে বললেনঃ আপনার কিংবা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির ভরসায় আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই নি। আমি, মহাবীর কর্ণ এবং ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিনজন একত্রিত হয়ে পাণ্ডবদের হত্যা করব। আমি আমার জীবন, রাজ্য আর সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করব, কিন্তু সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের দেব না।

অঙ্গাধিপতি মহাবল কর্ণ দুর্যোধনের বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর কথার সমর্থন করে বললেনঃ মহারাজ! বন্ধু দুর্যোধন ঠিক কথাই বলেছে। আপনি পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, প্রভৃতি বৃদ্ধদের নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে বহুদূরে নিশ্চিন্ত আরামে সুখে রাজধানীতে অবস্থান করুন। আমি একাই সৈন্য পরিচালনা করে পাণ্ডবদের পরাভূত করব, এজন্য এঁদের কারো সাহায্যেরই প্রয়োজন হবে না। তেইশবার যিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন, সেই মহাধনুর্ধর মহর্ষি পরশুরামের শিষ্য আমি। তাঁকে প্রীত করে তাঁর কাছ থেকে সকলের অজ্ঞাত যে ব্রহ্মাস্ত্র আমি লাভ করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে আমি সবান্ধব পাণ্ডবদের বধ করব।

কর্ণের এই গর্বিত আস্ফালনে প্রীত হয়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন ও

ও শকুনি বার বার তাঁকে বাহবা দিতে লাগলেন। এই ঘটনায় কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর বাক্‌সংযম তিরোহিত হল। তিনি কর্ণকে তিরস্কার ক'রে বললেনঃ ওরে, ওরে মতিচ্ছন্ন নির্বোধ কর্ণ! যেমন নীচ সূতবংশে তোমার জন্ম, তেমনি হীন তোমার মানসিকতা। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বলেই এমন কথা বলতে সাহস করছ। কৃষ্ণাজুর্নের শক্তির যথার্থ পরিচয় তুমি পাও নি। তাই অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে বৃথা লম্ফঝম্ফ করছ। ধনঞ্জয় যে অমিত শক্তির অধিকারী, তোমাতে তার শতাংশের একাংশও নেই। নীচ সূতদম্পতির পুত্র হওয়াতেই তোমার স্পর্ধা এত সীমাহীন হয়ে উঠেছে। প্রকৃত বীর কখনও অকারণ দম্ভ করে না। দুষ্টবুদ্ধি পাপিষ্ঠ! রণক্ষেত্রে কেশবার্জুনের মিলিত শক্তির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ঘটলেই তোমার এই অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলোয় মিশে যাবে। দুরাত্মা রাধেয়—

ভীষ্মের এরূপ মর্মঘাতী উক্তিতে মহাবীর কর্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেনঃ মহারাজ! আমি এমন কোনও অপরাধ করি নি, যার জন্য পিতামহ দেখা হলেই সকলের সামনে আমাকে এ রকম কটু কথা বলে সব সময় অপমান করতে পারেন। পিতামহ মহারথী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর এই দুর্ব্যবহার আমার কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন এই রাজসভায় বা যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ আমায় দেখতে পাবেন না। —সখা দুর্যোধন! তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না। আমার পরাক্রম তো তুমি জান, আমার শক্তিতেও তোমার আস্থা আছে। অকারণ বাক্‌যুদ্ধের চেয়ে শরযুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করাই আমি বেশি পছন্দ করি। আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, পিতামহের অবর্তমানে সসৈন্যে পাণ্ডবদের আমি একাই সংহার করব।

অহঙ্কারী কর্ণের অসমীচীন প্রতিজ্ঞায় রাজসভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই হাহাকার করে উঠলেন। একবাক্যে সবাই তাঁর অবিবেচনার জন্য নিন্দা করতে লাগলেন। কর্ণ রাজসভা পরিত্যাগে উদ্যত হলেন। কলগুঞ্জন কিছুটা প্রশমিত হলে ভীষ্ম তাঁকে সম্বোধন করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে শান্তকণ্ঠে বললেনঃ মূর্খ কর্ণ! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করলে, তার

পরিণতির কথা একবারও ভাবলে না। তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হলে চির অপরাজেয় ভীষ্মের মৃত্যুবরণ প্রয়োজন। বৎস দুর্যোধন! ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মৃত্যুর ইচ্ছা তোমার নষ্টবুদ্ধি বান্ধব কর্ণই প্রথম তাঁর অন্তরে জাগ্রত করল।

এই কথা বলার পর মহামতি ভীষ্ম সেখানে আর দাঁড়ালেন না। তিনি দ্রুত রাজসভা পরিত্যাগ করলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র 'কি হল, কি হল' বলে হায় হায় করতে লাগলেন।

সেকালের রাজনীতিতে গুপ্তচরদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা ছিল রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের অন্যতম অঙ্গ। কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, কি বৈদেশিক নীতিনির্ধারণে—সর্বত্রই এদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। দক্ষ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান গুপ্তচরদের রাজ্যের প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হত। ছোট বড় সমস্ত রাজাই যে যাঁর প্রয়োজন ও সামর্থ অনুসারে গুপ্তচর নিয়োগ করতেন ও তার জন্য তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। যাদের কাজে রাজা সন্তুষ্ট হতেন, তাদের আবার পর্যাপ্ত পারিতোষিক উপঢৌকন প্রদান করা হত। বস্তুত. গুপ্তচরবৃত্তি সমকালের রাজনীতিতে এতখানি আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করেছিল যে প্রত্যেক রাজাই প্রত্যক্ষভাবে এর সমর্থন করতেন। এই বৃত্তির সুষ্ঠু পরিচালনায় যে রাজা যত দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর আধিপত্য তত বিস্তৃত হয়েছে।

হস্তিনাপুর রাজ্যের আয়তনই কেবলমাত্র বিশাল ছিল না; তার লোকবল, সৈন্যবল, ঐশ্বর্য ও সম্পদেরও যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল। বাহুবল ও অর্থবলের রাজযোটক মিলনের ফলেই এই রাজ্য বহুদিন ধরে সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত এই রাজত্বের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য মদগর্বী মহারাজা দুর্যোধন ছিলেন গুপ্তচরদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তিনি প্রতিনিয়ত আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সংবাদ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে অসংখ্য পারদর্শী ও বিচক্ষণ গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। এই গুপ্তচরেরা স্বদেশ ও বিদেশকে জালের

মত ঘিরে রাখত এবং উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তা তাঁর কর্ণগোচর করত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে উপপল্লব্য নগর থেকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে যাদবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজসভায় আসছেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুপ্তচরের মাধ্যমে কৌরব রাজসভায় পৌঁছোতে বেশি দেরি হল না বাসুদেব আসন্ন মহাসমরে পাণ্ডবদের অন্যতম সহায় ও সমগ্র শক্তির প্রধান উৎস—এ কথা কারো অজ্ঞানা নয়। কৌরবেরাও তা ভাল করেই জানেন। বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও দূরদর্শী চিন্তানায়ক হয়েও যে কেন তিনি যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বেচ্ছায় এতখানি ঝুঁকি নিয়ে শত্রুব্যূহ কৌরব রাজসভায় আসতে আগ্রহী হয়েছেন, তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

এই সংবাদ শ্রবণ করে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। পাণ্ডবভীতি তো তাঁর ছিলই, তার উপর শ্রীকৃষ্ণভীতিও তাঁর কম নয়। জন্মান্ধ হবার জন্য তিনি নিজের চোখে কোনদিন তাঁকে দেখেন নি সত্য; তবু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল। অদ্ভুত মানুষ এই শ্রীকৃষ্ণ! তিনি রাজা হয়ে দ্বারকাপুরীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নি বটে, কিন্তু সমগ্র যাদবগোষ্ঠীর উপর তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত হয়ে উঠেছে। অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, সাত্বৎ, ক্রোষ্টু, কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন যাদবসঙ্ঘের তিনিই প্রধান অগ্রণী পুরুষ তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ধৃষ্টতা বা তাঁকে অতিক্রম করার স্পর্ধা তো দূরের কথা, তাঁর সামান্য অনুরোধও অগ্রাহ্য করার সাহস যাদবদের কারো নেই। অনন্যতুল্য বাহুবল, অপরিসীম বুদ্ধিবল ও অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্যই তিনি রাজা না হয়েও আজ সমগ্র মানবজাতির কাছে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। এহেন শ্রীকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে পুত্রস্নেহপ্রবণ স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তিত হওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয়। তাই তিনি পুত্রদের বিশেষ করে দুর্যোধনকে ডেকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বললেন: তোমরা নিশ্চয় শুনেছ যাদবপ্রধান বাসুদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে বিনা আহ্বানে হস্তিনাপুরে আসছেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের সন্ধির মাধ্যমে চিরস্থায়ী শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর আসার কারণ বলে জানতে পেরেছি, এ ছাড়া অন্য কোনও

উদ্দেশ্য তাঁর আছে কিনা জানি না। তোমাদের সবাইকে সমস্ত ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক না কেন ; তিনি যে সমগ্র যাদবগোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তি এবং হস্তিনাপুর রাজতন্ত্রের একজন সম্মানীয় অতিথি, সে বিষয় সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তোমরা সকলে তাঁর যথোচিত আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে আর যাতে কোনও ত্রুটি না ঘটে, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবে। রাজধানীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্থানে বড় বড় সুদৃশ্য তোরণদ্বার তৈরি করাবে এবং তার ধ্বজদণ্ড, পতাকা ও পুষ্পমালায় সুশোভিত করাবে। পথে পথে এমনভাবে জলষেকের ব্যবস্থা করাবে, যাতে বাসুদেবের গমনাগমন কালে ধূলিরাশি না উৎক্ষিপ্ত হয়। রাজপথ, গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহ ও অট্টালিকাগুলি নানাবর্ণের আলোকমালায় উৎসবরজনীর মত সুসজ্জিত করে তুলবে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গের লোকজনদের রাত্রিবাসের জন্য সুন্দর কারুকার্যখচিত মনোরম একাধিক পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাও। তাঁর পরিচর্যার জন্য দক্ষ পরিচারকবৃন্দ, উন্নত-শ্রেণীর পাচকগণ, সুন্দরী তরুণী নর্তকীসমূহ ও অল্পবয়স্কা লাবণ্যময়ী বারাঙ্গনাদের নিযুক্ত কর। ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয়ের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যেন অব্যাহত থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তাম্বল ও অবসর বিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থাদিরও শৈথিল্য যেন কারো নজরে না পরে। অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের আহারের জন্যও পর্যাপ্ত চণক, তৃণাদি ও প্রচুর পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত কর। রথাদি ও অন্যান্য যানাদি রাখারও স্থান সংরক্ষিত করে রাখবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন তোমাদের কোনও ব্যবস্থাতেই অসন্তোষ প্রকাশ না করেন।

মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র সে যুগের একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে প্রলোভিত করে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেন। তাই কেবলমাত্র পুত্রদের আদেশ করেই তিনি স্বস্তি পেলেন না। পরে রাজসভায় সকলের উপস্থিতিতে তিনি অমাত্য বিদুরকে ডেকে বললেন ঃ দেখ বিদুর! যাদবপ্রধান বাসুদেব হস্তিনাপুরের বিশেষ মাননীয় রাজঅতিথি। রাজঅতিথি হিসাবে তার উপযুক্ত সম্মান রক্ষার জন্য আমি তাঁকে কিছু বহুমূল্য উপহার প্রদান করতে চাই। আমার অপর্যাপ্ত রত্নভাণ্ডার থেকে জনার্দনের প্রীতির অনুকূল উৎকৃষ্ট

রত্নসমূহ নির্বাচন কবার দায়িত্ব তোমার উপরে অর্পণ করছি। আমি তাঁকে শক্তিশালী দ্রুতগামী চতুরশ্বযোজিত ষোলটি স্বর্ণ ও রত্নশোভিত সুদৃশ্য রথ, সানুচর আটটি সমরনিপুণ মদমত্ত হস্তী, অজাতগর্ভা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা লাবণ্যময়ী একশ যুবতী দাসী, সমসংখ্যক স্বাস্থ্যবান অল্পবয়স্ক দাস, পার্বত্য অধিবাসীদের প্রস্তুত অগণিত সুন্দর কম্বল এবং বহু মনোহর মৃগচর্ম উপহার দেব মনস্থ করেছি। দুর্যোধন ব্যতীত আমার সমস্ত পুত্র ও পৌত্র, সুসজ্জিতা সালংকারা বারাঙ্গনারা এবং কল্যাণীয়া কন্যারা মুখমণ্ডল অনাবৃতা করে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে প্রবেশের পর থেকে পথ-পরিক্রমায় তাঁকে অনুসরণ করবে।

বিদুর মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভীষ্ট আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁকে বললেন : মহারাজ ! আপনি এখনও কপটতা পরিত্যাগ করে সত্য ও সরল পথে চলুন। তাতে পাণ্ডবদের তুলনায় কৌরবেরাই বেশি লাভবান হবেন। আপনি ধর্মরক্ষার অভিপ্রায়ে বা শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধাবশত বহুমূল্য উপহারগুলি তাঁকে প্রদান করতে ইচ্ছুক হন নি, এগুলির দ্বারা তাঁকে প্রলুব্ধ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আপনার মূল্যবান উপহারগুলি যে তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হচ্ছে না, এ কথা বুঝতে তাঁর এতটুকু দেরি হবে না। পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য তো দূরের কথা, সামান্য পাঁচটি গ্রামও আপনি তাদের দিতে প্রস্তুত নন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁকে স্বপক্ষে আনতে চাইছেন। আপনার এই অযৌক্তিক ইচ্ছা কোনদিন সফল হবে না। মনে রাখবেন, যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ মদ্রাধিপতি শল্য নন। ছলনার সাহায্যে উপঢৌকনের প্রাচুর্যে শল্যকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। অর্থ, সম্পদ, আপ্যায়ন কোনকিছুর দ্বারাই আপনি তাঁকে বশে আনতে বা পাণ্ডবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। পাণ্ডবেরা যেমন শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শত প্রলোভনেও ধর্মপক্ষ কোনদিন পরিত্যাগ করেন নি। যেখানে ধর্ম, সেখানেই বাসুদেব ; যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত, সেখানেই তিনি বিরূপ। আবার কেশবার্জুন পরস্পর অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কেশব থেকে অর্জুনকে বা অর্জুন থেকে কেশবকে কখনও পৃথক করা

যায় না। তিনি বারিপূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আর কুশল-প্রশ্ন ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করবেন না। যদি তাঁর যোগ্য সম্বর্ধনা করার ঐকান্তিক ইচ্ছা আপনার হয়; তবে তিনি যে প্রার্থনা নিয়ে এখানে আসছেন, তা পূরণ করুন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত করে হস্তিনাপুরের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শান্তি বজায় রাখুন। তা হলেই তিনি প্রীত হবেন।

মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্রীকৃষ্ণকে মূল্যবান উপহার প্রদানের অভিপ্রায় জানতে পেরে দুর্যোধন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি সবার সামনে প্রতিবাদ করতে পারছিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে এর বিরুদ্ধভাব পোষণ করছিলেন। বিদুরের উক্তিতে তিনি তাঁর মানসিক ইচ্ছা পূরণের পথ দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে সমর্থন করে বললেনঃ পিতা! তাত বিদুর সত্যি কথাই বলেছেন। আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বজনপূজ্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং হস্তিনাপুর রাজসভার মাননীয় অতিথি, সে সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই। তাঁর আপ্যায়নে যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না ঘটে, আমি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে তাঁকে আমাদের এত মহার্ঘ উপহার দেওয়া আদৌ সমীচীন নয়। এতে সকলে মনে করতে পারেন, আমরা ভয় পেয়ে উপহার দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইছি। শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদের প্রতি আসক্তি আর পাণ্ডবদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি আজ আর কারো অজানা নয়। আমরা শতভাবে শত চেষ্টা করেও তাঁকে আমাদের পক্ষে আনতে পারব না। সন্ধি আমাদের কাম্য নয়, আমরা যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ ভিন্ন কখনও পাণ্ডবদের অকারণ আস্ফালন স্তব্ধ করা যাবে না। আমরাও কোনদিন শান্তি পাব না।

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের ছলনা প্রচেষ্টায় ও দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনের হীন মানসিকতায় ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি রাজসভার মর্যাদা বজায় রেখে গম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ বাসুদেব সংসারে বসবাস করলেও তিনি জাগতিক বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ। তোমরা তাঁকে যথোচিত সম্মান কর বা না কর, তাতে তাঁর কিছুই যাবে-আসবে না। তিনি তাতে এতটুকু ক্রুদ্ধ হবেন না। কিন্তু তাঁকে যেন কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা না হয় বা তাঁর কথায় কোনরকম উপেক্ষা দেখানো না হয়। তিনি

সর্বদা সকলের কল্যাণকর ধর্মানুমোদিত সঙ্গত কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ প্রিয় ব্যবহার করো।

মহামতি ভীষ্মের এই উক্তি দুর্যোধনের মনঃপূত হল না। তিনি কাউকে কিছু না বলে সভাগৃহ পরিত্যাগ করলেন।

## ॥ নয় ॥

কার্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে উষালগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ভাগিনেয় অভিমন্যু ও বধূ উত্তরাকে নিয়ে যাদবদের সঙ্গে কৌরবদের রাজসভায় শেষবারের মত সন্ধির প্রচেষ্টায় যাবেন. উপপ্লব্য নগরে ক'দিন ধরে সেজন্য তৎপরতার অন্ত নেই। মহাযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তাঁর এভাবে হস্তিনাপুর যাত্রা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমকালীন সংঘাতমুখর রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই দৌত্যের সাফল্য বা অসাফল্য যাই ঘটুক না কেন, আগামী দিনে এরই উপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস। এই দৌত্য সফল হলে একদিকে যেমন বর্তমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং বন্ধ হবে সাম্রাজ্যবাদী মদগর্বী সংঘশক্তির সঙ্গে নির্যাতিত নিপীড়িত জাগ্রত গণচেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তেমনি বিফল হলে বিপর্যস্ত হবে অগণিত ছোট বড় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থৈর্য এবং সূচিত হবে অচিন্তিতপূর্ব ভীষণতম রক্তাক্ত ক্ষাত্রমেধ যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ আগেই ঘোষণা করেছেন যে যাদবগোষ্ঠীর বহির্ভূত কোনও রাজা, রাজপুত্র বা রাজপুরুষেরা তাঁর সঙ্গে যাবেন না। কে কে তাঁর প্রধান দেহরক্ষী দায়িত্ব পালন করবেন, কিভাবে তাঁরা রাজসভায় অবস্থান করবেন, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে কাদের নির্বাচন করা হবে, তারা কে কি ছদ্মবেশে সেখানে যাবে, কোন কোন দাসদাসী ভারবাহী নর্তকী সঙ্গে থাকবে, কি কি অস্ত্রশস্ত্র বা কত পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য ইন্ধন প্রভৃতি কোন কোন যানে কি করে যাবে,—বাসুদেব সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তত্ত্বাবধান করার সার্বিক দায়িত্ব যাদববীর সাত্যকির উপর ন্যস্ত করেছেন। বিভিন্ন রাজা ও বীরদের সহযোগিতায় এই শুভযাত্রা ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহে আলোচনার পরের দিন রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যাদবপ্রধান সাত্যকি পূর্বেকার নির্দেশ অনুসারে বিশ্রামকক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে অভিবাদন করে বললেন ঃ বৃষ্ণিকুলতিলক ! আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। তোমার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় এসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ অধীরভাবে তাঁরই আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে পাশের আসনে বসাতে বসাতে বললেন ঃ এস, এস সাত্যকি ! আমি বিশেষ কারণে তোমাকে একাকী গোপনে এখানে আসতে বলেছি। মন্ত্রগুপ্তি রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। সকলের সামনে রাজনীতি সম্পর্কে যেমন সব কথা বলা উচিত নয়, তেমনি গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেলে রাজনৈতিক সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি এখন তোমায় যা বলব, তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ অনুমানও না করতে পারে। এ সংবাদ সর্বপ্রকার গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করবে। শোন সাত্যকি ! কুরুরাজ দুর্যোধন মহাপাপিষ্ঠ। তার এবং তার পাপচক্রের সঙ্গীদের পৃথিবীতে অকরণীয় কোনও কাজ নেই। যদিও ক্ষত্রিয়সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দূত অবধ্য, তবুও ভালমন্দ সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে পথ চলা প্রয়োজন। অকারণ ঝুঁকি নেয়াতে হটকারিতাই কেবল প্রকাশ পায়, তাতে সমস্যার কোনও সুষ্ঠু সমাধান হয় না। আমাকে বা আমাদের কাউকে যাতে দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন রাজসভার মধ্যে কোনরকম বিপদে ফেলতে না পারে, তার জন্য তুমি সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। সভাগৃহের প্রবেশ দ্বার সব সময় এমনভাবে করায়ত্ত করে রাখবে, আমাদের প্রবেশ ও প্রস্থানে যাতে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু এক মুহূর্তও তা কাউকে বুঝতে দেবে না। দশজন শস্ত্রধারী মহাবল যাদবপ্রধান আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি তো থাকবেই, তুমি ছাড়া আরো নয়জন মহাবীরকে নির্বাচন করা ও পরিস্থিতি অনুসারে পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব আমি তোমারই উপর অর্পণ করছি। আমাদের সঙ্গে দাসদাসী, ভারবাহী, সারথি, নর্তকী ব্যতীত তোমার নির্বাচিত এক সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক যাদবসৈন্য ছদ্মবেশে সেখানে যাবে। রাজসভার বাইরে তারা অপেক্ষা করবে। তারা যে যুদ্ধ ব্যবসায়ী, একথা

যেন তাদের কথাবার্তায় চলাফেরায় ও আচারব্যবহারে কোনক্রমেই প্রকাশ না পায়। সকলের ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সবার অলক্ষ্যে এমনভাবে নেবে, যাতে কেউ তা কল্পনাও করতে না পারে। প্রয়োজন-বোধে মুহূর্তমধ্যে ছদ্মবেশী সৈনিকেরা যাতে সশস্ত্র যোদ্ধায় পরিণত প্রস্তুতি নিতে বিভিন্ন রথী, মহারথী, সৈন্যসামন্ত, দাসদাসী, নর্তকী প্রভৃতির ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। পথে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় বা সেখানে গিয়ে কেউ যাতে কোন প্রকার বিপদে না পড়েন, সেইজন্য যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, দ্রৌপদী সুভদ্রা এবং সমবেত রাজন্য-বর্গ ও রাজপুরুষেরা, বিশেষ করে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, মৎস্যাধিপতি বিরাট, চেদিশ্বর, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, নাগাধিপতি, কেকয়রাজের পঞ্চপুত্র, যাদববীর চেকীতাল, মগধরাজ সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, শঙ্খ, উত্তর, শ্বেত প্রভৃতি রাজপুত্রেরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সমস্ত কার্যের যিনি কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ, সন্ধি প্রস্তাবের যিনি প্রবক্তা এবং দৌত্যের যাবতীয় দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, সেই যাদব শ্রেষ্ঠ বাসুদেবের আচরণের কিন্তু কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। জাগতিক হিসাব-নিকাশ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে এক দুর্লভ দুর্জেয় অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারী তিনি। সব কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি যেমন নির্লিপ্ত ভাবে প্রতি-নিয়ত অবস্থান করেন, আজও তাঁর আচরণে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হল না। প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে আজও তিনি রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা পরিত্যাগ করে গাত্রত্থান করলেন। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্নানাদি সমাধানের পরে শুচিবস্ত্র পরিধান করে তিনি নিত্যকার মত সূর্যপূজো ও অগ্নিপূজো হোমাদি সমাপন করলেন। পরিশেষে যাত্রার উপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তিনি ঊষাসমাগমের কিছু আগে সকলের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধানে মূল্যবান পীতম্বর, বক্ষস্থল দুর্ভেদ্য বর্মে আচ্ছাদিত, কণ্ঠদেশে মণিমাণিক্য খচিত মহার্ঘ মুক্তাহার দোদুলমান, কর্ণে রত্নময় কর্ণভূষণ, বাহুদ্বয়ে রত্নদীপ অঙ্গদ ও বলয় এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছশোভিত সুবর্ণমুকুট।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে সমবেত বীরবৃন্দ ও জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। তিনি একে একে সকলের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

করে উপস্থিত মুনিঋষিবৃন্দ ও ব্রাহ্মণদের এবং হোমাগ্নিকে পরিভ্রমণ করলেন। পরে তিনি একহস্তে সর্বজনশ্রুত পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অপর হস্তে সুদর্শন চক্র ধারণ করে তাঁর বিখ্যাত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন। সুদক্ষ সারথি দারুক পরিচালিত এবং বলাহক, মেঘপুষ্প শৈব্য ও সুগ্রীব নামক শ্বেতবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী অশ্বসমূহ বাহিত এই রথটিকে আজ সুগন্ধযুক্ত অসংখ্য পুষ্পমালা, নববিকশিত বৃক্ষপল্লবসমূহ, ব্যাঘ্রচর্ম ও নানারঙের পতাকাদি দ্বারা বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে। রথের উপরে তাঁর বিখ্যাত কৌমদকী গদা, দীর্ঘায়ত ধনুক, শরবন্ধ তূণীর, তোমর, খড়্গ, শক্তি, ভিন্দিপাল, অঙ্কুশ, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাচ্ছে। তার সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি দশজন মহারথী উপযুক্ত অস্ত্রসমূহে সজ্জিত হয়ে পৃথক পৃথক রথে আরোহণ করলেন এবং তাঁর ঠিক পশ্চাতে অপর একটি সুসজ্জিত রথে উঠলেন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ও বধূ উত্তরা। পিছনে ছদ্মবেশে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এক সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক, ভারবাহকেরা ও অগণিত দাসদাসী প্রভৃতি। এদের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাখা হয়েছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বহুল ভোজ্যদ্রব্য, ও ইন্ধনাদি পূর্ণ শকটসমূহ এবং অসংখ্য অশ্ব ও হস্তী। রথী, মহারথী, সৈনাসামন্ত, লোকলস্কর, দাসদাসী, শকটাদি প্রভৃতি নিয়ে এক দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মিছিল গড়ে উঠল।

ধীরে ধীরে রাত্রির অবসানে পূর্বাকাশ নবারুণের রক্তিম আলোয় রাঙা হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণেরা মাঙ্গলিক স্বস্তিবাচন পাঠ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার পরমলগ্ন সমাগত দেখে পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অগ্রসর হবার অনুমতি দিলেন। সকলের সমবেত জয়ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কুলবধূরা উলুধ্বনি দিল এবং বাতায়ন ও অলিন্দ থেকে পুরমহিলারা পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। মানুষের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ এবং রথচক্র ও শকটচক্রের ঘর্ষণ প্রভৃতি একত্রিত হয়ে যেন বিশাল সমুদ্রগর্জনে রূপান্তরিত হল। কার্তিক মাসের সূচনায় হেমন্ত ঋতুর ঊষাকালের স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়ায় প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সেই বিরাট মিছিলকে নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। পঞ্চপাণ্ডব, রাজন্যবর্গ, রাজপুত্রগণ ও রাজপুরুষেরা কিছু-

দূর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেলেন; তারপর সকলেই প্রত্যাবর্তন করলেন।

হস্তিনাপুর যাত্রার সূচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ দেখা দিল। অকস্মাৎ মেঘমুক্ত গগনে ভয়ংকর বজ্রনির্ঘোষ হতে লাগল, ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠল। বিকট শব্দে অশনি সম্পাত ঘটল। নির্মেঘ আকাশ থেকে অজস্রধারায় বারি বর্ষিত হলে, শিবাকুল তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করল। এবং মড় মড় করে আপনা থেকে জঙ্গলে বৃক্ষ উৎপাটিত হল। প্রকৃতির এই বিপর্যয়ে সমগ্র জীবজগৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল। অন্যান্য যাদব-বীরদের মতন শ্রীকৃষ্ণও এই সব ঘটনায় বিশেষ চিন্তিত হলেন বটে, কিন্তু যাত্রার গতি বিন্দুমাত্র শ্লথ করলেন না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের এই ব্যতিক্রম যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা তেমনই হঠাৎ চলে গেল। সমস্ত নিসর্গ প্রকৃতি আবার পূর্বেকার প্রাত্যহিক রূপ ধারণ করল। সূর্যালোকে ধরিত্রী অগের মতই ঝলমল করে উঠল। পাখির কলকূজনে বনস্পতি পবনরায় মুখরিত হয়ে উঠল ও জীবজগৎ শান্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সারাদিনে আর কোনও ঘটনা ঘটল না। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীরা কখনও তৃণাচ্ছাদিত সমতল পথে, আবার কখনও বন্ধুর পার্বত্যপথে, কখনও বা নদীতটরেখা বেয়ে, আবার কখনও বা গভীর অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে, কখনও দ্রুত আবার কখনও বা মন্থরগতিতে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর নানাবিধ দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে হস্তিনাপুরের দিকে এগিয়ে চললেন। এইভাবে দিনভোর অনেক পথ অতিক্রম করার পরে তাঁরা যখন বৃকস্থল গ্রামে এসে উপনীত হলেন, তখন অস্তমিত সূর্যের শেষ-রশ্মির আভায় পশ্চিমাকাশ শেষবারের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, বৃকস্থল গ্রাম হস্তিনাপুর থেকে বেশি দূর নয়। পরের দিন প্রত্যুষে যাত্রা করলেই প্রাতঃকালে সেখানেই পেঁছানো যায়। রাতের গভীরে রাজধানীতে যাওয়া বাসুদেবের কোনক্রমেই সমীচিন ও নিরাপদ বলে মনে হল না। সেজন্য তিনি সেই গ্রামেই রাত্রি অতিবাহিত করার সংকল্প করলেন। তিনি সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি মহারথীদের তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচারকেরা

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রাত্রি যাপনের উপযোগী বিরাট পটমণ্ডপের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হোল এবং পাচকেরা সকলের আহারের জন্য বহুল পরিমাণে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করল।

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাস্নান সমাপ্ত করে হৃষ্টচিত্তে সেই পটমণ্ডপে সন্ধ্যাকালীন সন্ধ্যাপূজাদি নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপন করলেন। বাসুদেব সেখানে এসেছেন জানতে পেরে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা উৎফুল্ল হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের রাতের আহারের জন্য আহ্বান জানালেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁর অমায়িক ব্যবহারে প্রীত হলেন ও বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে আহারাদি করে তিনি সেখানে রাত্রিযাপণের জন্য শয্যাগ্রহণ করলেন।

বৃকস্থলগ্রামের পটমণ্ডপের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রাত্যহিক কাজকর্মের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। অন্যান্য দিনের ন্যায় তিনি এখানেও রাত্রির শেষ ক্ষণে শয্যাত্যাগ করে গাত্রথান করলেন। তারপর যথারীতি প্রাতঃকৃত্য, স্নান, পূজা ও হোমাদি সমাপন করে তিনি সেখানকার ব্রাহ্মণদের প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে সকলের আশীর্বাদ নিলেন। তিনি সমাগত গ্রামবাসীদের সঙ্গেও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন। সবাই তাঁর আন্তরিকতায় আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বার বার তাঁর জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এভাবে গ্রামবাসী জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তিনি সদলবলে পূর্বেকার মতন সারিবদ্ধ হয়ে হস্তিনাপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। স্থানীয় অধিবাসীরাও তার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে অনেকদূর গমন করলেন।

কিছুক্ষণ পরে অভিমন্যু ও উত্তরাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের সঙ্গে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে রাজপথে অগণিত কারুকার্যময় তোরণদ্বার নির্মিত হয়েছে। অসংখ্য পুষ্পমালা ও পতাকায় তাকে সজ্জিত করে তোলা হয়েছে। পর্যাপ্ত জলসিঞ্চনের ফলে রাজপথ সম্পূর্ণরূপে ধূলিমুক্ত ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি গৃহদ্বারে স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত বারিপূর্ণ কুম্ভ, তার উপর আম্রপল্লব ও সশিষ নারিকেল সভা পাচ্ছে। পথের দু'ধারে, বাতায়নে,

অলিন্দে ও সৌধচূড়ায় বহু নরনারী বাসুদেবের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে উঠল এবং তার ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল।

রাজধানীর উপকণ্ঠে কৌরব প্রধান ভীষ্ম, অমাত্য বিদুর ও সঞ্জয়, আচার্য দ্রোণ, শাস্ত্রজ্ঞ কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ও পৌত্রেরা, অশ্বত্থামা, গান্ধার নৃপতি শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং অগণিত অস্ত্রধারী সৈনিক ও রাজপুরুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে সংবর্ধনা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে সকলে অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানালেন, তিনিও সবার সঙ্গে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করলেন। দীর্ঘপথ পরিক্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিশাল প্রাসাদে উপনীত হলে তিনি যাদবদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে সাত্যকি আর কৃতবর্মাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। বাসুদেব এসেছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁকে নির্ধারিত স্বর্ণসিংহাসনে বসতে বললেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবচন পাঠ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করলে তাঁকে গো, মধুপর্ক ও অর্ঘ প্রদান করা হল। তিনি সাগ্রহে তা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদের আতিথ্য স্বীকারে অস্বীকৃত হলেন। তিনি বললেনঃ আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে এসেছি, কৌরব রাজপ্রাসাদের আমন্ত্রিত হয়ে আসি নি। ধর্মরাজের দৌত্যকার্য রাজপ্রাসাদের আতিথ্য গ্রহণের চেয়ে আমার কাছে বেশি মূল্যবান। আমি ঠিক করেছি, ধর্মাত্মা বিদুরের গৃহেই বসবাস করব। সেখানে পিতৃস্বসা মহারাণী কুন্তীদেবী ও অন্যান্য পাণ্ডব পুরমহিলারা রয়েছেন। অনেকদিন তাদের দেখিনি, তাঁদের কোনও সংবাদ পাই নি ; তাঁরা এখন কেমন আছেন, তাও আমার অজ্ঞাত। তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি আজ বিশ্রাম করে কাল সকালে রাজসভায় সকলের সামনে মহারাজা চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য নিবেদন করব। এখন অনুমতি দিন, আমি প্রস্থান করি।

বাসুদেব সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন।

হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি আমাত্য গৃহে সকলের সঙ্গে গমন করলেন। বিদুরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দু'চার কথা বলার পরে তিনি অভিমন্যু ও উত্তরাকে নিয়ে পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি তাদের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেলেন এবং পিতৃস্বসাকে প্রণাম করে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। দীর্ঘকাল বাদে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কুন্তীদেবীর অন্তরে নতুন করে পুত্রদের জন্য বিরহবেদনা দেখা দিল। তিনি তাঁকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। প্রচণ্ড দুঃখে তিনি এতটা কাতর হয়ে পড়লেন যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনও কথা বলতে পারলেন না। পরে কিছুটা সামলে নিয়ে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন: বৎস! তোমাকে দেখে আজ আমার বার বার পুত্রদের কথা মনে পড়ছে। রাজপুত্র ও রাজ্যের অধিশ্বর হয়েও না জানি তারা কত দুঃখকষ্ট উপভোগ করছে। বাল্যকালে তারা পিতৃহীন হলে প্রতিকূল অবস্থার চাপে বিহ্বল না হয়ে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের প্রতিপালন করেছি। একদা যারা অগাধ ঐশ্বর্য ও পর্যাপ্ত সম্পদের মধ্যে সুখে জীবন অতিবাহিত করত, তারা কি করে বার বছর বনবাসের আর এক বছর অজ্ঞাতবাসের মর্মান্তিক বেদনা সহ্য করল? ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমসেন ও ধনুর্ধর অর্জুন কেমন আছে? আমার প্রিয় পুত্রবীর নকুল কেমন রয়েছে? যাকে মুহূর্তমাত্র না দেখতে পেলে সমস্ত জগৎ-সংসার আমার কাছে অন্ধকার বলে বোধ হত, সেই মাতৃবৎসল মহা অভিমানী সহদেবের সংবাদ বল? আমার কাছে যে পুত্রদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, বিনা দোষে যে রজস্বলা অবস্থায় কৌরবদের রাজসভায় লাঞ্ছিতা সেই পাণ্ডবকুললক্ষ্মী তেজস্বিনী কল্যানী দ্রৌপদীর খবর কি? এদের সবার কুশল সংবাদের জন্য সর্বদা আমার চিত্তে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তুমি এদের কথা বলে আমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত কর। বাসুদেব! আমি দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের দোষ দেব কি, আমার এই মন্দভাগ্যের জন্য সব সময়ে নিজেরই পিতা শূরসেনকে নিন্দা করতে ইচ্ছে করে। পিতা কোনদিনও আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য দেন নি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, কন্দুক নিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলা করে বেড়াতাম, কোন রকম সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করি

নি: তখন আমার নির্দয় পিতা কন্যাস্নেহ বিসর্জন দিয়ে আমাকে মহারাজা কুন্তিভোজের হাতে সমর্পন করেন। বঞ্চনাময় জীবনে শান্তি কোথায় ? আমি বাল্যকালে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। যৌবনে শ্বশুরস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, স্বামীহারা হয়ে ভাশুর ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা বার বার প্রবঞ্চিত হয়েছি। অহর্নিশা এই দুঃসহ জীবনযন্ত্রনা সহ্য করে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ? কেশব ! তুমি তোমার সখা গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় আর মহাপরাক্রান্ত বৃকোদরকে বলো, ক্ষত্রিয় রমণী পুত্রের বীরত্বকাহিনী শোনার জন্যই পুত্র প্রসব করে তাদের সেই বীরত্ব প্রকাশের দিন সমাগত হয়েছে। তারা যদি এই সময় কাপুরুষের মতন বৃথা অতিবাহিত করে, তবে আমি চিরকালের জন্য তাদের পরিত্যাগ করব। নকুল আর সহদেবকে তুমি বলবে যে তারা যেন বিক্রমার্জিত সম্পদ উপভোগ করে এবং জীবনের মায়া ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়চিত বীরত্বের পরিচয় দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কুন্তীদেবীর দুঃখে আদ্র হয়ে উঠল। তিনি তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ আপনি অশ্রুপাত করবেন না। চোখের জল ফেলা আপনার শোভা পায় না। আপনার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমণী সংসারে দুর্লভ। আপনি একদিকে যেমন রাজকন্যা, রাজপালিতা, রাজপত্নী ও রাজজননী ; অন্যদিকে তেমনি বীরদুহিতা, বীরপত্নী ও বীরজননী। আপনার পুত্রদের বীরত্বের খ্যাতি লোকের মুখে সর্বত্র প্রচারিত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আর কারো যুদ্ধে এতখানি ধৈর্য দেখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে যে কোনও পরিস্থিতিতে স্থিরচিত্ত বলেই তাঁর যুধিষ্ঠির নামকরণ সার্থক হয়েছে। মহাবলশালী ভীমসেনের তুল্য শক্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। সখা পার্থ ও ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয়, তাঁর সমকক্ষ ধনুর্বিদ সর্বকালে দুর্লভ। নকুল আর সহদেবও বীর্যবত্তায় অতুলনীয়। আপনার পৌত্রেরাও শৌর্যেবীর্যে অসমান্য খ্যাতি অর্জন করেছে। অভিমন্যু, ঘটৎকচ, ইরাবান, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন, যৌধেয়, সর্বগ, সর্বগত, নিরমিত্র, সুহোত্র প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। আমার কথা শুনুন, আপনি দুঃখ পরিহার করুন। আপনার ভাগ্যাকাশে শীঘ্রই সৌভাগ্য সূর্য উদিত হবে। আপনার পুত্রেরা ও পৌত্রেরা আসন্ন মাহাসমরে শত্রুনিপাত করে

রাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হবে। আপনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে আবার মহারাজা চক্রবর্তীর আসনে অধিষ্ঠিত হতে দেখবেন !

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কুন্তীদেবী আনন্দিত হলেন। তিনি সাগ্রহে তাঁকে বললেন ঃ তোমার কথাই যেন সত্যি হয় বাসুদেব ! ঈশ্বরের কাছে এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা !—কিন্তু কবে কবে সেদিন আসবে বলতে পার ? সেদিনের প্রত্যাশাতেই আমি এই দুর্বিষহ জীবন আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। নইলে পরগৃহে পরান্নে আমার একদিনও বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। সমস্ত হস্তিনাপুরের আবহাওয়া একটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে যে এই পরিবেশে প্রতি মুহূর্তে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ধর্মাত্মা বিদুর ছাড়া মনের কথা খুলে বলার মত একজন উপযুক্ত লোকও আজ সারা দেশে নেই। সবাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিজেদের সামান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এত ব্যস্ত যে অপরের কথা কেউ ভাবতেও পারছে না। ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্রদের প্রবৃত্তি যে কতদূর নীচে নামতে পারে, চোখে না দেখলে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণের অধর রহস্যময় মধুরহাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে উত্তর করলেন ঃ পিসীমা ! কৌরবদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হবার পরমলগ্ন উপস্থিত হয়েছে। অচিরেই তাঁদের দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।—পিসীমা ! কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, আপনার পৌত্র অভিমন্যু আর পৌত্রবধূ উত্তরা বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা আপনাকে আর অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করতে আমার সঙ্গে এসেছে।

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রিয় পৌত্র অভিমন্যু ও নববধূ উত্তরা বাইরে প্রতীক্ষা করছে জেনে তিনি বলে উঠলেন ঃ বাইরে কেন ? তাদের এখুনি ভেতরে নিয়ে এস।—দাঁড়াও ! আমি নিজেই তাদের নিয়ে আসছি।

কুন্তীদেবী দ্রুত কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। অনেকদিন না দেখার জন্য অভিমন্যুর কাছে তাঁর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেলেও মাতুলের সঙ্গে তাঁকে দেখে সে পিতামহীকে চিনতে পারল। সে ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করার সাথে সাথে উত্তরাও তাঁকে প্রণাম করল। তিনি দু'হাতে তাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ অভিমন্যু আর

উত্তরা আপনার কাছে রইল পিসীমা! আপনি ওদের নিয়ে গল্প করুন। ওরা দু'দিন আপনার সাথে থাকবে। ক্ষাত্রধর্মের প্রথানুসারে নবদম্পতিকে গুরুজনদের প্রমাণ করার ব্যবস্থা আপনি করবেন। আমি বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। অভিমন্যু উত্তরাকে পর্যাঙ্কে দু'পাশে বসিয়ে কুন্তীদেবী কথা বলতে লাগলেন।

## ॥ দশ ॥

কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা করার পর শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ মহারাজা দুর্যোধনের প্রাসাদে উপনীত হলেন। সে সময় দুর্যোধন নিভৃত আলোচনা কক্ষে ভ্রাতা দুঃশাসন, মাতুল শকুনি, অঙ্গাধিপতি কর্ণ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ মিত্ররাজা বশম্বদ করচ ও আশ্রিত নৃপতিদের সঙ্গে বাসুদেবের আগমনের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি সম্বন্ধে নানা রকম কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হতে পারেন, তা সকলের চিন্তারও আগোচর ছিল। তাই তাঁকে আকস্মিকভাবে একাকী সেই কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সবাই বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেলেন। গৃহকর্তা দুর্যোধন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি দ্রুত মধুপর্ক, পানীয়জল ও কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁর যথোচিত সংম্বোর্ধনা করে এক সুবর্ণ-মণ্ডিত আসনে বসতে অনুরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদনে সে সব গ্রহণ করলেন এবং বয়ঃক্রম অনুসারে উপস্থিত ব্যক্তিদের আলিঙ্গন, নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় সমাপন করে সেই সুবর্ণ সিংহাসনে বসলেন। দুর্যোধন বললেনঃ বাসুদেব! তোমাকে আমার প্রাসাদে স্বেচ্ছায় আসতে দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। তুমি শুধু হস্তিনাপুরের বিশেষ রাজঅতিথিই নও, আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তোমাকে আমার এখানেই আজ ভোজন করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের কথায় সম্মত হলেন না। তিনি প্রতিবাদ করে বললেনঃ মহারাজা দুর্যোধন! এমন অনুরোধ তুমি আমায় করো না,

যা রক্ষা করতে আমি অপারগ। আমি হস্তিনাপুর রাজ্যে এসেছি কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে আর তোমার প্রাসাদে এসেছি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে। তোমার দেওয়া মধুপর্ক, পানীয়জল ও কুশলপ্রশ্ন গ্রহণ করে আমি তোমার সম্মান রক্ষা করেছি, কিন্তু কিছুতেই এখানে ভোজন করতে পারব না। ও অনুরোধ তুমি আমায় করো না।

কেশব সকলের সাক্ষাতে সরাসরি আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করায় দুর্যোধন ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর বদন মণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি অভিমানাহত কণ্ঠে বললেন ঃ বাসুদেব! তুমি উভয় পক্ষেরই হিতাকাঙ্খী। তুমি পাণ্ডবদের যেমন, আমাদেরও তেমনি নিকট আত্মীয়। তুমি আমার বৈবাহিক। আমার একমাত্র কন্যা লক্ষ্মনা তোমার পুত্রবধূ—শাম্বের স্ত্রী। তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই, কলহ বা যুদ্ধও হয় নি কোনদিন। তবে এ রকম ব্যবহার করছ কেন?

বাসুদেবের আকর্ণবিস্তৃত যুগ্ম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নতার বিলুপ্তি ঘটায় মুখমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করল, তিনি মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন ঃ ভরতবংশধর! আমি পাণ্ডবদের দূত হয়ে এসেছি। দূতেরা কৃতকার্য হলেই আতিথ্য ও অন্ন, গ্রহণ করতে পারে। আমি কাল সকালে রাজসভায় সকলের সামনে আমার প্রার্থনা নিবেদন করব। তুমি যদি সে প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে নিশ্চয় আমি তোমার প্রাসাদে ভোজন করব। মহারাজ! পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক থাকলে মানুষ তার অন্নগ্রহণ করে অথবা বিপন্ন হয়ে জীবনসংশয় দেখা দিলে যে পরের অন্নগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তোমার প্রতি আমার সম্প্রীতি প্রকাশিত হয়, এমন কোনও কাজ তুমি কোনদিন কর নি অথবা আমি এখনও সে রকম বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ি নি! তাই আমি তোমার অন্ন আহার করতে পারি না।—তারপর একটু থেমে ঈষৎ হাস্য করে তিনি বললেন ঃ আর আত্মীয়তার কথা বলছ? অন্যের আত্মার সঙ্গে আত্মিক সাযুজ্য বা মিল থাকলে তবেই তার আত্মীয় হওয়া যায়। যাঁরা তোমার শত্রু তাঁরাই আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ—নিকট-আত্মীয়। পাণ্ডবদের সঙ্গেই আমার আত্মার যোগ রয়েছে, তোমার সঙ্গে

নেই। তুমি বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে তাঁদের অকারণ হিংসা কর, কিন্তু তাঁরাই আমার জীবনস্বরূপ। আত্মা আর প্রাণ যেমন অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার সম্পর্কও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। যে তাঁদের শত্রু, সে আমারও শত্রু : যে তাঁদের সঙ্গে বৈরিতা করে, সে আমার সঙ্গেও বৈরিতা করে। পাণ্ডবেরা আজও ধর্ম পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু তুমি ধর্ম ত্যাগ করে বিনা কারণে তাঁদের অনিষ্ঠসাধনে বদ্ধপরিকর। এর জন্য এমন কোনও অন্যায় কাজ নেই, যা তুমি কর নি। তোমার দুষ্টবুদ্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, বিষবৎ, পরিত্যজ্য। সেজন্য দৌত্যে সাফল্য অর্জনের পূর্বে তোমার অন্ন ভোজন করা বা তোমার প্রাসাদে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ধর্মাত্মা বিদুরের গৃহে অন্নগ্রহণ করে সেখানেই রাত্রিযাপন করব ঠিক করেছি।

শ্রীকৃষ্ণের মর্মঘাতী উক্তিতে দুর্যোধনের ক্রোধ বর্ধিত হল, তার রক্তিম লোচন দ্বয়ে অগ্নি বর্ষিত হতে লাগল, অতলান্ত অহঙ্কার আহত হওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পরে কিছুটা সংযত হয়ে তিনি বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গি করে তাঁকে বললেন ঃ দাসীপুত্র বিদুরের গৃহে ? আমার গগনচুম্বী সুউচ্চ মনোরম প্রাসাদ আর মহার্ঘ উপাদেয় আহার্যের চেয়ে অন্যয ক্ষত্তা বিদুরের ক্ষুদ্র গৃহ আর নিকৃষ্ট অন্নই তোমার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল ? তোমার যেমন স্বভাব তেমনি তোমার প্রবৃত্তি। যে আধারে যে থাকতে অভ্যস্ত, তাই তার ভাল লাগে। আর সেজন্যই বোধ হয়, নীচ বংশজ ক্ষত্তা বিদুরই তোমার একান্ত গ্রহনীয় হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ জন্মের কারণ বা জাতির বিচার করে মানুষের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, পরিচয় পেতে হয় মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই করে। নিজের জন্মের জন্য কেউ দায়বদ্ধ নয়, কিন্তু তার কর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। বিদুর আজীবন সত্য আর ধর্মকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন, কখনও কোনও কারণে তিনি সত্যভ্রষ্ট বা ধর্মচ্যুত হন নি। তিনি ক্ষত্রিয় তো দূরের কথা, যে কোনও ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও পরম শ্রদ্ধেয়। তাঁর মতন মহাত্মা সমগ্র হস্তিনাপুরে দ্বিতীয় নেই। তোমার দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত উপাদেয় রাজভোগের চেয়ে ধর্মাত্মা বিদুরের সামান্য ক্ষুদের অন্নকেও আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।

দুর্যোধনকে আর কোনও কথা বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। কেউ তাঁকে বাধা দিতে বা কোন প্রকার ক্ষতি করতে সাহসী হলেন না। সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ্যে নিদারুণ অপমানে দুর্যোধন অভিমানাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এই ঘটনার পর সেই নিভৃত আলোচনাকক্ষে কথাবার্তার কোনও অগ্রগতি ঘটা অসম্ভব হয়ে উঠল। বিরসবদনে একে একে সবাই প্রস্থান করলে কূটনীতিবিদ শকুনি দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ বৎস ! শ্রীকৃষ্ণের কথায় তুমি উত্তেজিত না হযে বা দুঃখ না করে তাকে জব্দ করার চেষ্টা কর। ওই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া। পাণ্ডবদের নিজস্ব কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ওর বুদ্ধিতেই তারা চলেছে। ওই তোমার বিরুদ্ধে একদিকে পাণ্ডবদের তাতাচ্ছে, অন্যদিকে তোমার শত্রু বিভিন্ন রজশক্তির সঙ্গে সলাপরামর্শ করে যোট পাকাচ্ছে। যুদ্ধের সময় যে করেই হোক না কেন, শত্রুর শক্তি ক্ষয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি ওকে রাজসভায় বন্দী করে চিরদিনের জন্য অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে রাখ। তাহলেই দেখতে পাবে, পাণ্ডবেরা আর যুদ্ধ করতে সাহস করছে না। শক্তিশালী শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে এ সুযোগ তুমি স্বেচ্ছায় নষ্ট কর না। এখন আমার কথা না শুনলে পরে পস্তাতে হবে জেনে রেখো।

শকুনির কথা শুনে দুর্যোধন যেন পাণ্ডবদের নিগৃহীত করার জন্য নতুন একটা আশার আলো দেখতে পেলেন। বাসুদেবকে বন্দী করে পাণ্ডবদের হেনস্তা করার কথা একবারও তাঁর মনে উদিত হয় নি। এভাবে কোনদিন চিন্তাও করেন নি তিনি। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। তাই মাতুলের কথায় তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তিনি আনন্দপ্লুত কণ্ঠে বললেন ঃ মাতুল ! আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি নে। উপযুক্ত সময়ে আপনি আমাকে উপযুক্ত পবামর্শ দিয়েছেন। আমি বন্ধু কর্ণ আর ভাই দুঃশাসনকে বলে সব ঠিক করছি।

শকুনি হেসে উঠলেন। দুর্যোধনকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন ঃ তুমি দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ কর ক্ষতি নেই, কিন্তু কর্ণকে এর একটি

কথাও এখনও জানিয়ো না। মনে রেখো, মন্ত্রগুপ্তিই কূটনীতির প্রধান অঙ্গ। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের গোপনতা রক্ষিত না হলে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। মহাবীর কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষ সন্দেহাতীত, কিন্তু বাসুদেবের প্রতি তাঁর অন্তরের দুর্বলতা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। তাই কর্ণকে আগে জানালে তোমার কার্যোদ্ধার তো হবেই না, পরন্তু তার দিক থেকে প্রচণ্ড বাধাও আসতে পারে। তুমি দুঃশাসনের সাথে পরামর্শ করে দ্রুত কার্য সম্পন্ন কর।

শকুনির যুক্তির তাৎপর্য অনুধাবণ করতে দুর্যোধনের বেশি দেরি হল না। তিনি সানন্দে তার কথায় সম্মত হলেন। তিনি প্রতিচারীকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার দুঃশাসনকে ডেকে পাঠালেন। কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করা যায়! সে সম্বন্ধে দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল। শেষে দুঃশাসনের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হলে সুষ্ঠভাবে তা সম্পাদনের জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন।

কুন্তীদেবী পৌত্র অভিমন্যু ও পৌত্রবধূ উত্তরাকে পর্যঙ্কে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর প্রিয় পুত্র। অসাধারণ শৌর্যবীর্যের খ্যাতি সর্বজনবিদিত. সকলেই একবাক্যে তাঁর ধনুর্বিদ্যায় নৈপুন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুত্রের বীরত্বকাহিনী জননী কুন্তীদেবীরও অজ্ঞাত নয়। বহু ঘটনার সঙ্গেই তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। পুত্রের বীরত্বগর্বে তিনি গর্বিতা। পৌত্র অভিমন্যুও ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার কথা তিনি শুনেছেন। মাতুলের শিক্ষাগুণে আর মায়ের তত্বাবধানে সে পিতার অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যায় কম দক্ষতা অর্জন করে নি। সে পিতার তুল্য ধনুর্ধর আর মাতুলের ন্যায় শক্তিধর। শৌর্যবীর্যে এই বয়সে এতখানি নৈপুন্য প্রদর্শন করা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পরে অপরিসীম খ্যাতিমান সেই পৌত্রকে ও তার নবপরিনীতা বধূকে কাছে পেয়ে পিতামহীর আনন্দের সীমা ছিল না। পুত্রদের ও পুত্রবধূ দ্রৌপদীর বিরহজনিত শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখমণ্ডল আবার হাসিতে ভরে উঠল। তিনি সস্নেহে বললেন ঃ অভিমন্যু! তোমাকে আর উত্তরাকে একসঙ্গে

দেখে যে কি আনন্দ পেয়েছি. তা অনেকদিন স্মরণ থাকবে। এত আনন্দ আমি বহুদিন পাই নি। তুমি শুধু আমার অর্জুনের সুযোগ্য পুত্রই নয়. পাণ্ডববংশেরও উপযুক্ত সন্তান। পাণ্ডবেরা আজ রাহুগ্রস্ত। পাপিষ্ঠ দুর্যোধন কপট অক্ষক্রীড়ায় তাদের সর্বস্ব অপহরণ করেও তৃপ্ত হয় নি। কবে যে রাহুমুক্তি ঘটবে জানি না। তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে বা ভাগ্যহীনা এই বৃদ্ধার জীবনে আর দেখা হবে কিনা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তুমি এখন বড় হয়েছ, সব বুঝতে পারবে। এত কাছের মানুষ হয়েও আমরা কৌরবদের চক্রান্তে একসাথে থাকতে পারছি না। আমাদের কেউ কেউ দ্বারকায় তোমার মাতুলালয়ে ; আবার কেউ কেউ পাঞ্চালে দ্রৌপদীর পিত্রালয়ে আর কেউ কেউ বা আমার সঙ্গে হস্তিনাপুরে বিদুরের আশ্রয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আপনজনকে নিকটে পাওয়া তো দূরের কথা, শত ইচ্ছা সত্বেও একবার দেখতে পর্যন্ত পাচ্ছি না—এই চিন্তা নিরন্তর আমার অন্তরকে বেদনাতুর করে তুলেছে।

পিতামহীর দুঃখে অভিমন্যুর হৃদয় দ্রবীভূত হল। বেদনার্দ্র কণ্ঠে সে বলল ঃ আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার বিষাদরজনী শেষ হয়ে এসেছে। অচিরেই এর অবসান ঘটবে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হলেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে! শক্তিমত্তায় আর যুদ্ধবিদ্যায় পাণ্ডবেরা যে কৌরবদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কিছু আগে মৎস্যরাজের উত্তর গোগৃহে পিতার একক যুদ্ধে বিশাল কৌরববাহিনীর পরাজয়ই তা প্রমাণিত করেছে। শুনেছি, সেই যুদ্ধে নামকরা মহাবীরদের লাঞ্ছনার কোনও সীমা ছিল না। উত্তরার পুতুলের—

উত্তরা এতক্ষণ কথা বলে নি, চুপ করে ছিল। অভিমন্যুর কথা শেষ হতে না হতেই সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে সে বলল ঃ পিতামহি! অভি সত্যি কথা বলছে। আমি তো কৌরবদের আর পাণ্ডবদের কথা কিছুই তখন জানতাম না। আমার নৃত্যসঙ্গীতশিক্ষক বৃহন্নলাই যে বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব, তাও আমার- অজানা ছিল। সৈরিন্ধ্রীরূপিণী বড়মার অনুরোধে উত্তরদাদা যখন ছদ্মবেশী পিতাকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন আমি পুতুলখেলার জন্য দাদাকে যুদ্ধজয়ের পরে কৌরবদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেটে আনতে বলেছিলাম। পরে জানতে পেরেছি,

পিতার বানে-সমগ্র কৌরববাহিনী মূর্ছিত হলে দাদা আমার জন্য তাঁর আদেশে পোষাকের কিছু কিছু অংশ নিয়ে আসেন। পিতা অবশ্য বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্য ও শাস্ত্রবিদ কৃপাচার্যের দেহে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। আমি তো সব সময়ে অবাক হয়ে ভাবি যে একা পিতার যুদ্ধেই যাঁদের এই অবস্থা পাণ্ডবদের সমবেত যুদ্ধে তাঁরা কতক্ষণ রণস্থলে স্থির থাকতে পারবে ?

উত্তরা অসামান্যা সুন্দরী ও গৌরবর্ণা ; সে অল্পবয়স্কা হলেও দীর্ঘদেহী ; অকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়, উন্নত নাসিকা ও ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম তাকে আরো অপরূপ করে তুলেছে। সে সামান্যতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রোধে তার গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে যায় এবং সে ছেলেমানুষী করতে থাকে। মাঝে মাঝে তাকে অকারণ রাগাতে ভীষণ ভাল লাগে অভিমন্যুর। তখন একটা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে সে। তাই উত্তরাকে রাগিয়ে দিতে সে তাচ্ছিল্যভরে বলে ঃ যুদ্ধের তুমি কি বোঝ উত্তরা ? যে সম্বন্ধে কিছু জান না, সে বিষয়ে কোনও কথা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি দিনরাত পুতুলখেলতে ভালবাস আর সেটাই তোমার বয়সী মেয়েদের উপযুক্ত। বড়মা বলেছে, কৌরববাহিনীর রণহুঙ্কার শুনে তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।

উত্তরা অভিমন্যুর উক্তিতে ক্রুদ্ধ হল। তার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল ও গৌর বদনমণ্ডল আরক্ত হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল ঃ মিথ্যুক কোথাকার ! দেখছেন পিতামহি, দেখছেন ! আপনার নাতির কেবল মিথ্যে কথা। আমার বড়মার নাম করা হচ্ছে। চল না ফিরে উপপ্লব্য নগরে, বড়মাকে বলে তোমার মিথ্যে কথা বলা বার করছি।

উত্তরা অকস্মাৎ এভাবে ক্রুদ্ধ হওয়াতে অভিমন্যু আনন্দিত হল। তাকে আরো রাগিয়ে দিতে বলে উঠল ঃ বল গে তুমি তোমার বড়মাকে। নালিশ করে তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। তোমার মতন আমি তাঁর আঁচল ধরা নই। আমি তাঁকে ভয় করি নে। বুঝলে বড়মার আদুরে দুলালী !

অতিরিক্ত ক্রোধে উত্তরা আর কোনও কথা বলতে পারল না। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে সে পর্যাঙ্কলাগল থেকে উপাধান তুলে নিয়ে সজোরে অভিমন্যুকে আঘাত করতে লাগল। অভিমন্যু তার অবস্থা

দেখে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

বৃদ্ধ কুন্তীদেবী পৌত্র ও পৌত্রবধূর কাণ্ডকারখানা দেখে হাসতে হাসতে বললেন: থাম, থাম তোমরা! অভি! কি ছেলেমানুষী করছ? শোন, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আহারাদি করে আমার সঙ্গে তোমাদের বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্মের ও জ্যেষ্ঠপিতামহ ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে চল। এতদূরে যখন এসেছ, তখন তোমাদের গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণও আমাকে সেই ক্ষাত্রপ্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

আহারাদির পরে কুন্তীদেবী প্রথমে তাদের সঙ্গে করে বিদুরগৃহে যে সব পাণ্ডব পুরমহিলারা ছিলেন, সবার সাথে একে একে দেখা করিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের ভার্যা দেবিকা, ভীমসেনের পত্নী বলন্ধরা ও কালী, নকুলের স্ত্রী করেনুমতী এবং সহদেবের পত্নী বিজয়া ও জরাসন্ধদুহিতা প্রভৃতিকে প্রণাম করা হলে কুন্তীদেবী সারথিকে রথপ্রস্তুত করতে আদেশ করলেন। তিনি নবদম্পতিকে নিয়ে রথে করে সবার আগে প্রবীনতম কৌরব ভীষ্মের প্রাসাদে উপনীত হলেন। কুন্তীদেবীর সঙ্গে অভিমন্যু ও উত্তরাকে দেখে বৃদ্ধ ভীষ্ম তাদের চিনতে পারেন নি, হঠাৎ দু'জন যুবক-যুবতীকে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কুন্তীদেবী তাঁকে প্রণাম করে বললেন: তাত! এরা আপনার প্রিয় ধনুর্ধর মহাবীর অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু আর তার বধূ বিরাট রাজকন্যা উত্তরা। এরা আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে। বৎস! বৃদ্ধপিতামহ অপরাজেয় ভীষ্ম তোমাদের সম্মুখে, তাঁকে তোমরা প্রণাম কর।

অভিমন্যু ও উত্তরা নতজানু হয়ে পরম ভক্তিভরে প্রবাদ পুরুষ ভীষ্মকে প্রণাম করল। তিনি দু'হাতে তাদের বুকের কাছে টেনে নিলেন। তিনি প্রথমে অভিমন্যুকে বললেন: বৎস! দীর্ঘায়ু হও! পিতার অপেক্ষা যশস্বী হও!—এবং পরে উত্তরাকে বললেন: স্বামী সোহাগিনী হও! সৌভাগ্যবতী হও! উপযুক্ত মহাবীর বংশধরের জননী হও! আমার এই মুক্তাহার আশীর্বাদ স্বরূপ তুমি গ্রহণ কর। —তারপর তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে কুন্তীদেবীকে বললেন: পুত্রি কুন্তি! অভিমন্যু ও উত্তরাকে দেখে খুব আনন্দ পেলাম। এত

কাছের মানুষ, তবু দীর্ঘকাল না দেখার জন্য আমি তাদের চিনতে পারি নি। এ দুঃখ আমার কোনদিনও যাবে না। দুর্যোধনের মন্দবুদ্ধিতে আপনজন ক্রমশঃ একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এক এক সময়ে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এসব দেখার জন্যই কি এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে আমি অতন্দ্র প্রহরীর মতন তিনপুরুষ ধরে ভরতবংশকে রক্ষা করে এসেছি। এত করেও আমি বুঝতে পারছি যে তার শেষরক্ষা আমি করতে পারব না। দুর্যোধনের লোভে আর ধৃতরাষ্ট্রের হীনমন্যতায় বুঝি সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এটাই আমার জীবনের চরম মর্মান্তিক পরিণতি। পিতার দেওয়া ইচ্ছামৃত্যু বরে আমাকে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা তাও দেখে যেতে হবে।

সুগভীর হতাশায় অতিবৃদ্ধ মহারথী ভীষ্ম ভেঙে পড়লেন। অনেকক্ষণ সেখানে কথাবার্তা বলে কুন্তীদেবী সেখান থেকে বিদায় নিয়ে অভিমন্যু ও উত্তরাকে সঙ্গে করে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন! বিশ্রামরত ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পত্নী গান্ধাররাজনন্দিনী গান্ধারদেবী অভিমন্যু ও উত্তরার আগমন সংবাদ জানতে পেরে তাদের আশীর্বাদ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সৌজন্যমূলক কথাবার্তায় কৃত্রিমতা প্রকাশ পেলেও মহারাণী গান্ধারীদেবীর কথায় আন্তরিকতা লক্ষ্য করে অভিমন্যু প্রীত হল। ধৃতরাষ্ট্র বললেনঃ স্নেহাস্পদ অর্জুনের পুত্র আর পুত্রবধূ আমাদের প্রণাম করতে আসায় কত যে আনন্দ পেয়েছি, তা বলতে পারব না। তোমরা দীর্ঘজীবী হও,—এই আশীর্বাদ করি। অমাত্য সঞ্জয়ের কাছে অভিমন্যুর বীরত্বের প্রশংসা শুনেছি। বড় হয়ে সে নাকি পিতার ন্যায় মহাধনুর্বিদ হয়ে উঠেছে। আমি দৃষ্টিহীন, জন্মান্ধ; কানে শোনা ভিন্ন আমার দেখার অধিকার নেই।

ধৃতরাষ্ট্র এই বলে চুপ করতেই গান্ধারীদেবী উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেনঃ কুন্তি! আমার মতন হতভাগিনী কেউ নেই। আমার পাপিষ্ঠ পুত্রের দোষেই আমার আপনজনেরা ধীরে ধীরে আমার কাছে পর হয়ে যাচ্ছে। এত ঐশ্বর্য আর সম্পদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেও তার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটল না। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তার বিনাশের কারণ হয়ে উঠবে। তোমার পৌত্র ও পৌত্রবধূ তা আমারও পৌত্র আর পৌত্রবধূ। আমিই তো সবচেয়ে বড়। অথচ দুদণ্ড তাদের পাশে

বসিয়ে শান্তিতে গল্প করার ক্ষমতা আমার নেই। মঙ্গলময় ঈশ্বর ওদের দু'জনকে সুখী করুন—কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গান্ধারীদেবী অন্তঃপুররক্ষিকাকে ডেকে তাদের নানাবিধ মহার্ঘ্য উপহার প্রদান করলেন।

সেখান থেকে সকলে দুর্যোধনের প্রাসাদে গেলে তাঁর পত্নী কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যা মহারাণী ভানুমতী তাদের পরিচয় পেয়ে তাচ্ছিল্যভরে ব্যঙ্গোক্তি করে উঠলেন: ভাল, ভাল, খুব ভাল হয়েছে, শুনেছি অর্জুন অজ্ঞাতবাসের সময়ে মৎস্যরাজ্যে বেতনভূক কর্মচারী হয়ে মহারাজা বিরাটের যে মেয়েটাকে নাচগান শেখাত, কৌশলে তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে রাজার বৈবাহিক হয়েছে। বনবাসী হয়েও প্রাচুর্যের মোহ তার এখনও যায় নি দেখছি। তা সে মেয়েটা বুঝি এই গৌরাঙ্গী সুন্দরী। দেখতে শুনতে তা বেশ ভাল। এর বাবা বুঝি আর পাত্র খুঁজে পেলেন না। হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে হা-ঘরে বিয়ে দিয়ে একেবারে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

এই বলে ভানুমতী প্রস্থানোদ্যত হলেন। তাঁর দাম্ভিকতাপূর্ণ নিকৃষ্ট ধরনের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে অভিমন্যু ভেতর ভেতর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তিনি স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হতেই সে গর্জে উঠল: আপনার দুষ্টবুদ্ধি স্বামীর মতই আপনিও দুর্মতিপরায়ণা আপনার কুচক্রী স্বামীর ষড়যন্ত্রেই অতুল ঐশ্বর্য সর্বস্ব অপহরণ করে আপনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবছেন। আপনার এই অহঙ্কারের অবসান ঘটার বেশি দেরি নেই। আসন্ন মমাসমরে ধার্তরাষ্ট্র বধূদের চিরবৈধব্যই তা প্রমাণিত করবে।

ভানুমতী ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন: সাবধান বনবাসী ভিক্ষুকপুত্র! এ কৌরব রাজপ্রাসাদ, এখানে পাণ্ডববংশধরের দম্ভ শোভা পায় না। সময় থাকতে এখনও আপনার পৌত্রের রসনা সংযত করুন অরণ্যচারী পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবি!

কুন্তীদেবী কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অভিমন্যু দৃঢ়কণ্ঠে বলল: আপনিও সাবধান মহারাণি! স্ত্রীলোক না হলে আপনার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা আমি আজই

দিতাম। স্ত্রীলোক বলে আপনাকে আমি ক্ষমা করছি। আর অরণ্যচারী অর্জুনপুত্র যে কতখানি বীর্যবত্তার অধিকারী, রাজপ্রাসাদে সুখৈশ্বর্যের মধ্যে বসবাস করেও যুদ্ধকালে সে পরিচয় আপনি পাবেন। জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন যেমন কৌরব রাজসভায় পট্টমহারাণী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ধার্তরাষ্ট্রদের তিনি গদাঘাতে মস্তক চূর্ণ করবেন, আমিও তেমনি পরম পূজ্যা পিতামহীর সাক্ষাতে আপনার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যে আসন্ন মহাসমরে আমি আপনাদের পুত্রদের বধ করব। আসুন পিতামহী, এস উত্তরা!—এই মুহূর্তে আমরা পাপিষ্ঠদের কলুষিত প্রাসাদ পরিত্যাগ করি।

অভিমন্যু নিমেষের মধ্যে কুন্তীদেবী ও উত্তরাকে নিয়ে অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। ভানুমতী কি করবেন বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে দুর্যোধনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, একথা হস্তিনাপুরের সর্বত্র প্রচারিত হতে বেশি সময় লাগল না। অচিরকালমধ্যে রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তা অবগত হলেন। এই সংবাদ শোনামাত্র কৌরবপ্রধান ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও কৃপাচার্য প্রভৃতি অনেকেই বিদুরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে স্ব স্ব বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করে আহারাদি করতে অনুরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আহ্বানও বিনয়নম্রভঙ্গিতে অস্বীকার করে বললেনঃ আপনারা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার পরম পূজনীয়। আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এতেই আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমার দীর্ঘকালের বাসনা, একদিন ধর্মাত্মা বিদুরের গৃহে ভোজন করব। অনেকদিনের পর আমার সে ইচ্ছা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। আপনারা এর প্রত্যবায় হবেন না। আমি যদি আপনাদের বিলাসবহুল ভোজ্যদ্রব্য ও উৎকৃষ্ট পানীয়ের লোভে ব্রাত্য বলে ধর্মপ্রাণ বিদুরের সামান্য ক্ষুদের অন্ন পরিহার করি, তবে আমি ন্যায় ও ধর্মের কাছে চিরকালের জন্য অপরাধী হয়ে থাকব। আমার শৈশব ও কৈশোর বৈশ্য গোপগৃহে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁদের স্নেহ, প্রীতি ও ভাল-

বাসা আজও আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আমি এতে ধর্মচ্যুত হইনি বা স্বধর্মও পরিত্যাগ করিনি। আজ পরম ধার্মিক ক্ষত্তা বিদুরের গৃহে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করলে আমার স্বধর্ম বিনষ্ট হবে না। আপনারা অহেতুক দুঃখ না করে ফিরে যান। কাল প্রাতঃকাল রাজসভায় আবার সাক্ষাৎ ঘটবে।

বাসুদেবের মিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হয়ে সকলে যে যাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। ধর্মাত্মা বিদুর তাঁকে নানারকম উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য, সুমিষ্ট পানীয় প্রভৃতি পরিবেশন করে সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন : মধুসূদন! তোমার যোগ্য সমাদর করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি এতেই পরম তুষ্ট হও। তোমার উপযুক্ত সংবর্ধনা করে কে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারে? তুমি যে অল্পতেই সদাতৃপ্ত, তা তোমার নিজেরই মহানুভবতা।

শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে প্রথমে সেই অন্ন ও পানীয় ব্রাহ্মণদের নিবেদন করলেন, পরে তিনি অনুচরদের নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তা আহার ও পান করলেন।

রাত্রিকালে সকলে আহারাদির পর শয্যাগ্রহণ করলে বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। অকস্মাৎ বাসুদেবের শত্রু পরিবেষ্টিত হস্তিনাপুরে আগমন বিদুরের মনঃপূত হয় নি। উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন, জীবনাদর্শ যত প্রকাশই পাক না কেন, ধর্ম ও ন্যায়ের যত পরিস্ফুরণই ঘটুক না কেন; উদ্ভূত পরিস্থিতি বা স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে আর পরিণতির কথা চিন্তা করে প্রত্যেকের কাজ করা উচিত। হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অসমীচীনের মতো কোনও কাজ করা অকর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সমকালের অন্যতম প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ হিসাবে সর্বত্র পরিচিত এতখানি বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে হঠাৎ শত্রুপুরীতে এসেছেন, তা বিদুর শত চিন্তা করেও কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারলেন না। এই না বোঝার জন্যই তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত চিত্তে তাঁকে বললেন : কেশব! তোমার বুদ্ধিমত্তার উপর আমার আস্থা আছে। তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর বিচক্ষণতাতেই শতধাবিভক্ত যাদবগোষ্ঠী আজ একত্রিত

হয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তোমার শত্রুবেষ্টিত হস্তিনাপুরে আসা একেবারে সমীচীন হয় নি। এ কাজ তোমার সেই বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। তুমি তো জান, দুর্যোধন আর তার সমর্থক দুষ্টচক্র না করতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনও ঘৃণ্য কাজ নেই। সে একে অধার্মিক, তায় অহঙ্কারী। ছেলেবেলা থেকে অন্ধপিতা ধৃতরাষ্ট্রের অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয়ে সে অসংযত ও দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—ষড়রিপুর প্রত্যেক রিপুই তার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। মূর্খতাবশত তার কোনও হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান নেই। কুরুপ্রধান ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শাস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাধনুর্ধর কর্ণপ্রভৃতির ভরসায় এবং অগণিত সৈন্য ও সমরোপকরণ সংগ্রহ করে সে নিজেকে অপরাজেয় মনে করছে। সে কখনও সন্ধিতে আগ্রহী হবে না, তোমার মূল্যবান সৎ উপদেশ গ্রাহ্য করবে না এবং তোমার মঙ্গলদায়ক বাণী শুনতে চাইবে না। পরন্তু সে চক্রান্ত করে তোমাকেই বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। যাঁরা তোমার পূর্বেকার শত্রু, যাঁদের তুমি পরাজিত করে ধন ও সম্পদ হরণ করেছ ; তাঁরা সকলেই দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছেন। সব সময়েই তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করছেন। রাজসভা শত্রু পরিবৃত। তুমি প্রাতঃকালে সেখানে কেমন করে যাবে ? মাধব ! পাণ্ডবেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি তাদের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য বিশেষ স্নেহ করি ! কিন্তু তুমি তাদের অপেক্ষাও আমার কাছে বেশি প্রিয়। তোমাকে অধিক প্রীতি করি বলেই এসব কথা বলছি।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের আন্তরিকতায় আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁকে বিচলিত হতে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ মহাত্মা বিদুর ! আপনার কথা খুবই যুক্তিসিদ্ধ। আপনি মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির মতনই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। পিতামাতার ন্যায় আপনার উক্তি মূল্যবান ও হিতকারী। আমি দুর্যোধনের মন্দমতি আর তার অনুগত পাপিষ্ঠ নৃপতিদের শত্রুতার কথা সম্যক অবগত হয়েই হস্তিনাপুরে এসেছি। আপনি আমার জন্য অকারণ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হবেন না। ধর্মসম্মত কার্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কেউ আমাকে আরব্ধ কার্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবর্তক দুর্যোধন

পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে দিনের পর দিন তাঁদের বঞ্চিত ও নিঃস্ব করে চিরতরে দারিদ্র্যের অন্ধকূপে নিমজ্জিত করতে চাইছে। একদল মানুষ ক্ষমতার দম্ভে আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রাচুর্যের চূড়ায় আরোহণ করে রক্তচক্ষু আস্ফালন করবে আর একদল মানুষের বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় জীবিকার সংস্থানও থাকবে না—এ কখনও চিরকাল চলতে পারে না, চলতে দেওয়াও উচিত নয়। ইতিহাসও কোনদিন এ অন্যায়কে ক্ষমা করবে না। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে শান্তিপ্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য। জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হলে যিনি সর্বপ্রকারে উভয়পক্ষের দ্বন্দ্ব উপশমের চেষ্টা না করেন, তাঁকে কখনও মিত্র বলা যায় না। আমি যদি শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন নাও করি, তবে আমাকে আর কেউ দোষারোপ করতে পারবেন না। দুর্যোধন আমার হিতকর কথা উপেক্ষা করলে তার ধ্বংস নিকটতর হয়ে উঠবে।

বাসুদেব ও বিদুরের নানারূপ অন্তরঙ্গ কথোপকথনে কখন যে রাত অতিবাহিত হয়ে গেল, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। পূর্বাকাশে নবারুণের রক্তিম আভা ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করে নৈমিত্তিক সূর্য ও অগ্নিপূজা সমাপ্তির পর হোমাদি করলেন। তারপর তিনি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের অর্থ দান করে রাজসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁকে প্রফুল্ল ও হাসিখুসি দেখাতে লাগল। তাঁর দেহে রাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তি বা অবসাদ তিরোহিত হল।

## ॥ এগার ॥

পরম শ্রদ্ধেয় যদুপতি বাসুদেব মহারাজা চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে হস্তিনাপুরে এসেছেন এবং প্রাতঃকালে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অমাত্য বিদুরের গৃহ থেকে কৌরব রাজসভায় যাবেন—একথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে খুব বিলম্ব ঘটল না। অচিরে রাজধানীর

আবালবৃদ্ধবণিতা তা অবগত হল। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অসামান্য শক্তিধর ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবেই সকলের কাছে পরিচিত। শৈশবে ও কৈশোরে তাঁরই শক্তিতে ও বুদ্ধিবলে সমস্ত গোকুল অনার্য অসুরদের কবলমুক্ত হয়েছে, যৌবনের উন্মেষলগ্নে তিনি মথুরাধিপতি দুর্দান্ত কংসকে বধ করে পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীকে বিবাহোত্তরকালের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রাজ্যচ্যুত কংসের পিতা ভোজরাজ উগ্রসেনকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মনীষায় অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, ক্রোষ্টু, কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত যাদবগণ একত্রিত হয়ে আজ অন্যতম শক্তিরূপে সকলের কাছে স্বীকৃতিলাভ করেছে। ইতিপূর্বে দ্যূতক্রীড়ার আগে তিনি একাধিকবার পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে তিনি অনেক-দিন আগে দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাঞ্চালরাজ্য থেকে নববধূ নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে মাত্র একবার এসেছেন। তিনি দ্বিতীয়বার আর কখনও আসেন নি। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা তাঁর কৃতিত্বের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত কাহিনী শুনলেও বয়স্ক ও বৃদ্ধবৃদ্ধা ব্যতীত তাঁকে কেউ কোনদিন দেখে নি। তাই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দর্শন করার জন্য অধীর আগ্রহে সমস্ত রাজপথ জনাকীর্ণ হয়ে উঠল, বাতায়ণ অলিন্দ ও সৌধচূড়া অগণিত পুরমহিলা বালকবালিকা ও বৃদ্ধবৃদ্ধার ভীড়ে পরিপূর্ণ হল এবং বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির সুউচ্চ শাখাতেও অসংখ্য মানুষ দেখা গেল।

বিদুরের গৃহের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটছে, তা ব্যক্তি পরম্পরার মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সবাই জানতে পারল, শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় যাবেন বলে ভোর হতে-না-হতেই মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাবীর অশ্বত্থামা, অমাত্য সঞ্জয় ও অন্যান্য সভাসদেরা, দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা, গান্ধারপতি শকুনি, মিত্র রাজন্যবর্গ, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ-বৃন্দ, ক্ষমতাসম্পন্ন বর্ষীয়ান পুরবাসীরা ও মুনি-ঋষিরা সেখানে উপনীত হয়েছেন। একটু পরে তারা শুনল যে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ব্যস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে রাজকীয় মর্যাদায় সসম্মানে রাজসভায়

আহ্বান করে আনার জন্য দুর্যোধন ও শকুনিকে সুসজ্জিত রথ, সৈন্য-সামন্ত, বাদ্যকর প্রভৃতি সহ বিদুরের গৃহে প্রেরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় এই সংবর্ধনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন জেনে সকলের বিস্ময় বেড়ে গেল। তারা শুনল যে তিনি তাঁর নিজের গরুড়ধ্বজ রথে যাদবদের সঙ্গে যাবেন বলেছেন। তারা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল যে প্রত্যাখ্যাত হয়েও দুর্যোধন ও শকুনি সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় আসবেন বলে সেখানে অপেক্ষা করছেন।

চতুর্দিকে সাজ সাজ রব! শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় গমন উপলক্ষ্যে কি কৌরবপক্ষ, কি যাদবপক্ষে—কোনও পক্ষেরই ব্যস্ততার অন্ত নেই। কৌরবদের সৈন্যসামন্ত ও রাজপুরুষেরা আগেই তৈরি হয়েছে। প্রভাতের অর্ধপ্রহর বেলা অতিবাহিত হবার পূর্বে যাদবেরাও প্রস্তুত হয়ে গেল। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপে কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হল না। প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম যথারীতি সমাধানের পর তিনি রাজসভায় গমনের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত হলেন। আবক্ষ দেহ সুদৃঢ় লৌহ-নির্মিত বর্ম ও শিরস্ত্রাণে আবৃত করে তা সুন্দরভাবে ঢাকতে মূল্যবান পীতবস্ত্র ও মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারাদি পরিধান করলেন। পরিশেষে তিনি দৈহিক ঔজ্জ্বল্যকে বর্ধিত করতে ও অপরের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করতে জগতে অদ্বিতীয় কৌস্তুবমণি গ্রথিত দুর্লভ হার কণ্ঠে ধারণ করে বক্ষ-দেশে লম্বিত করে দিলেন।

রাজসভায় যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে বাসুদেব বিদুরের গৃহের বাইরে এসে অন্যের অলক্ষ্যে চারিদিক একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তিনি দেখলেন, তেজস্বী বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত গরুড়ধ্বজ রথ প্রস্তুত করে সারথি দারুক উপস্থিত হয়েছে; পূর্বেকার নির্দেশ অনুসারে সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি দশজন যাদব মহারথীও স্ব স্ব স্থানে অপেক্ষা করছেন; অশ্বারোহী ও পদাতিক সহস্র যাদবসৈন্যও ছদ্মবেশে সেখানে প্রতীক্ষারত। তিনি দুর্যোধন ও শকুনি-কেও দেখতে পেলেন, তাঁরাও বহু সৈন্যসামন্ত ও রাজপুরুষদের নিয়ে এসেছেন। তিনি আরো দেখলেন, রাজপথের উভয়পার্শ্বে সাধারণ মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে। বাতায়নে, অলিন্দে, গৃহচূড়ায়, এমন কি

সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখাতেও তিল ধারণের স্থান নেই। সমগ্র হস্তিনাপুরী যেন বিশাল জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আর দেরি না করে মহাত্মা বিদুরের হাত ধরে দারুকের রথে আরোহণ করে দু'জনে পাশাপাশি বসলেন। তারপর তিনি পাঞ্চজন্য বাজিয়ে যাত্রার সময় ঘোষণা করতেই একসঙ্গে অসংখ্য বেণু, শিঙা প্রভৃতি বেজে উঠল। সমস্ত জনতা অভিভূত হয়ে তাঁর জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সারিবন্ধ হয়ে সকলে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললেন।

কৌরব রাজসভার দ্বারপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের রথ উপনীত হলে তাঁর সঙ্গীরা বেণু, শিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ সভাসদ ও অমাত্যেরা, মিত্র ও আশ্রিত রাজারা, এমন কি অমাত্য সঞ্জয়ের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিহীন মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রও রাজসভার প্রবেশদ্বারের বাইরে এলেন। সাত্যকি আর বিদুরের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করলে সকলে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে সভাকক্ষে নিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিছন পিছন সাত্যকি রাজসভায় প্রবেশ করলেন বটে, কিন্তু আর কোনও যাদব বীরই ভিতরে গেলেন না। কৃতবর্মা দ্বারদেশের কাছে এমনভাবে রইলেন যে প্রয়োজন হলে যে কোনও মুহূর্তে ভিতরে প্রবেশ করতে অথবা বাইরে প্রস্থান করতে পারেন। অন্যান্য আটজন মহারথী ছদ্মবেশী যাদব-সৈন্যদের সঙ্গে মিলে মিশে এতখানি একাকার হয়ে গেলেন যে যাদবদের সদাজাগ্রত সতর্ক পরিকল্পনা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

রাজসভায় যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের জন্য মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ মণিমুক্তারত্নাদি সুশোভিত সর্বতোভদ্র নামে এক সুবর্ণনির্মিত যে মূল্যবান আসন প্রস্তুত করিয়েছেন, সেই নির্দিষ্ট আসনে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল। অতসীকুসুমের অনুরূপ শ্যামবর্ণভাযুক্ত মহার্ঘ পীতম্বর ও কৌস্তবমণিধারী জনার্দন সেই আসনে উপবেশন করলে সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা স্ব স্ব আসনে আসীন হলেন। তাঁর আসনের অদূরে অমাত্য বিদুর মৃগচর্মাচ্ছাদিত সুবর্ণপীঠে এবং তাঁর ঠিক পশ্চাতে প্রবেশদ্বারের কাছে সাত্যকি বসলেন। তাঁর দক্ষিণে দুর্যোধন ও শকুনি এবং উত্তরে

সাত্যকির কাছাকাছি দুঃশাসন আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সম্মুখে বেশ কিছুটা দূরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বয়োবৃদ্ধ প্রবীন সভাসদ ও অমাত্যেরা বসলেন। মিত্র ও আশ্রিত রাজন্যবর্গ, বর্ষীয়ান পৌর প্রতিনিধিরা ও মুনিঋষিগণ সারিবদ্ধভাবে উপবেশন করলেন। সভাস্থলে সবাইকে দেখা গেলেও অঙ্গাধিপতি কর্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সতর্ক দৃষ্টি তা এড়িয়ে গেল না। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের কটূক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে মহাবীর কর্ণ যে প্রতিজ্ঞা করে কয়েকদিন আগে সভাস্থল পরিত্যাগ করেছেন, বিদুরের কাছ থেকে গত রাত্রে তা তিনি জানতে পেরেছেন। তাই তাঁর অনুপস্থিতির কারণ অনুমান করে নিতে তাঁর এতটুকু বিলম্ব ঘটল না।

সকলে উপবেশন করলে রাজসভা অকস্মাৎ নীরব হয়ে গেল। চতুর্দিকে একটা গম্ভীর স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কারো মুখে কোনও কথা নেই, সবাই পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাহ্নেই অবগত ছিলেন, আদর্শ ও নীতির দিক থেকে কৌরবেরা ও পাণ্ডবেরা দুটি ভিন্ন মেরুর দুই প্রান্তে এতদূরে অবস্থান করছেন যে উভয়পক্ষকে একত্রিত করে সন্ধি স্থাপিত করা এবং উভয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। এই প্রয়াস যে সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বাতুলতার নামান্তর মাত্র। হস্তিনাপুরের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করে, বিশেষ করে পিতৃস্বসা কুন্তীদেবী ও ধর্মাত্মা বিদুরের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। রাজসভার পরিবেশও যে আদৌ অনুকূল নয়, তা অনুভব করতেও বিচক্ষণ বাসুদেবের বেশি সময় লাগল না। সন্ধি যখন কিছুতেই হবে না এবং মদগর্বী দুর্যোধনই স্বয়ং তাঁর প্রধান অন্তরায়, তখন লোকের মুখ দেখে বুঝেসুঝে রেখেঢেকে কথা বলার আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করলেন না। তবু তিনি প্রথমে বিনীতভাবে সামনীতির প্রয়োগ করে মৃদুকণ্ঠে অথচ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ভরতকুলতিলক! আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। মহারাজা চক্রবর্তী ভরত প্রতিষ্ঠিত মহান বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনাদের বংশ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বংশই নয়, শতাব্দর পর শতাব্দ ধরে ত্যাগ, তিতিক্ষা, উদারতা, মানবিকতা ও

ধর্মানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য-শাসন করে জগতে দুর্লভ স্থায়ী কীর্তি ও প্রভূত যশ অর্জন করেছেন, আপনি সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিরাট বংশের স্তম্ভস্বরূপ। আপনার দূর-দর্শিতা, বিচক্ষনতা, বিচারবুদ্ধি ও মহানুভবতার উপরেই এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পাণ্ডবেরা কৌরবদের পর নন, মহান ভরতবংশেরই দুই শাখা—জ্ঞাতি ভাই। পাণ্ডবেরা চিরদিনই আপনার আজ্ঞাবাহী, কখনও আপনার কথা অমান্য করেন নি। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে তাঁরা আপনার আশ্রয়েই প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হয়েছেন। যৌবনে এখানে বাসকালে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে তাঁরা অন্যরাজ্যের ধনরত্ন আহরণ করে আপনাকেই তা নিবেদন করেছেন। আপনার আদেশে পৈতৃক হস্তিনাপুর সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করে তাঁরা অরণ্যসঙ্কুল অনুর্বর পার্বত্য খাণ্ডবপ্রস্থকে রাজ্য হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। আবার আপনার নির্দেশেই তাঁরা বার বছর বনবাসের ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু কোন কারণেই আপনার আদেশ পালনে অবহেলা করেন নি অথবা নিজেদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে অকারণ বিবাদে লিপ্ত হন নি। মহারাজ! বর্তমানে আপনার লোভী ও মদগর্বী পুত্রদের অপরিণামদর্শিতার ফলে ভারতবর্ষের গৌরব কৌরবেরা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনি কুরুপাণ্ডবের আসন্ন যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে কৌরবদের তথা সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন। কুরুরাজ! পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধ হলে কৌরবেরাই যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। যে রাজ্যের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে উভয়-পক্ষে বিবাদের সূত্রপাত, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য তো হস্তচ্যুত হবেই; পরন্তু মূল্যবান জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হবে। বীর্যবত্তায় ও রণনৈপুণ্যে পাণ্ডবেরা যে কৌরবদের তুলনায় বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ, তা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। এর বেশি উদাহরণ না দিয়ে আমি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মৎস্য-রাজ্যে উত্তর গোগৃহ যুদ্ধের উল্লেখ করছি। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি খ্যাতিমান মহারথী পরিচালিত সমগ্র কৌরব-বাহিনী যে একা ধনঞ্জয়েরও সমকক্ষ নন, সেখানকার যুদ্ধে কৌরবদের শোচনীয় পরাজয়ে নতুন করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ দেখুন-

দু'পক্ষ যদি একত্রিত হয়, তাহলে আপনি সবচেয়ে লাভবান হবেন। কুরুপ্রধান ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীদের সঙ্গে অমিতশক্তিধর ভীমসেন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর সব্যসাচী ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা যদি মিলিত হন ; তবে তাঁদের সমবেত শক্তিকে পরাভূত করতে পারেন, এমন শক্তিমান রাজা এই পৃথিবীতে নেই। আপনিই তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রধান হয়ে মহাসুখে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। তাই আমার অনুরোধ, আপনি পুত্রদের পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য করুন এবং তাঁদের প্রাপ্য হৃত ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ কথা বলে সাময়িক বিরতির জন্য একটু থামলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, এত লোক সমাগমেও রাজসভার সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে। কোথাও সূচীপতনের ন্যায় সামান্যতম শব্দও হচ্ছে না। সকলে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন ঃ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র! আমি মহারাজা চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে এলেও এখানে তৃতীয়পক্ষ মাত্র, ভরতবংশের কেউ নই। আমি যাদবগোষ্ঠীর বৃষ্ণিবংশীয়, কৌরবদের ধ্বংসে বা স্থায়িত্বে আমার কিছুই আসে যায় না। তবু আমি তাঁদেরই মঙ্গলের জন্য সন্ধির প্রয়াসী হয়েছি। মহাবল পাণ্ডবেরা যুদ্ধ অথবা সন্ধি উভয়েই প্রস্তুত। সন্ধি না হয়ে যুদ্ধ হলে অবশ্য তাঁদেরই লাভের সম্ভাবনা বেশি। সন্ধি হলে তাঁরা অর্ধেক রাজত্বের অধিকারী হবেন ; কিন্তু যুদ্ধ হলে সমগ্র রাজ্যই তাঁদের অধীন হবে। মদমত্ত হঠকারী কৌরব কখনও তাঁদের পরাজিত করতে পারবেন না। মহারাজ! রাজসভায় বহু গণ্যমান্য রাজন্যবর্গ ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের কাছেই আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত কিনা? অজাতশত্রু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যেরূপ আপনার সঙ্গে বরাবর শ্রদ্ধানম্রচিত্তে কনিষ্ঠজনোচিত ব্যবহার করেছেন, আপনিও তেমনি তাঁদের সঙ্গে গুরুজনতুল্য সদ্ব্যবহার করুন। আমি আশা করি, সমবেত বীরবৃন্দ নিশ্চয় আমার কথা সমর্থন করবেন। আপনিও আমার উক্তির সারবত্তা অনুধাবন করে মনে মনে তার সমর্থন না করে বিরোধিতা করতে পারবেন না। আপনি আপনার পুত্রদের লোভ আর

দুর্বুদ্ধি পরিহার করে সংযত হতে আদেশ দেবেন, না আসন্ন মৃত্যুবরণ করতে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবেন—চিন্তা করে দেখুন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং বর্ষীয়ান সুধীজনের সঙ্গে আলোচনা করে, আপনি যা সকলের পক্ষে হিতকর বলে বিবেচনা করেন, তাই করুন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দীর্ঘভাষণ শেষ করে বসে পড়লেন। তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মুনিঋষিরা ধর্মসঙ্গত ন্যায্য উক্তির জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু রাজন্যবৃন্দ তাঁর উক্তির সারমর্ম উপলব্ধি করে মনে মনে তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হলেও দুর্যোধনের অসন্তোষের ভয়ে মুখে তা প্রকাশ করলেন না, সবাই চুপ করে রইলেন। মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের মতন হাহাকার করে উঠলেনঃ যাদব-কুলপতি! তোমার প্রত্যেক কথাই যুক্তিযুক্ত, ধর্মানুমোদিত ও কালোপ-যোগী। তোমার মতই আমারও ঐকান্তিক ইচ্ছা, উভয়পক্ষ দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে পরস্পর মিলিত হোক। কিন্তু আমি কি করব? আমি একে জন্মান্ধ, তায় বার্ধক্যের জন্য অশক্ত হয়ে পড়েছি। বৎস শ্রীকৃষ্ণ! আমি স্বাধীন নই। দুরাত্মা পুত্রেরা আমার বাধ্য নয়। নষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন আমার কথা মান্য করে না। জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম, মহারাণী গান্ধারী, আচার্য দ্রোণ, অমাত্য বিদুর, সঞ্জয়, কৃপাচার্য প্রভৃতির কথাও গ্রাহ্য করে না। তুমি বরং ওকে বোঝাবার চেষ্টা কর।

শ্রীকৃষ্ণ দক্ষ কূটনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পর্যাপ্ত পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের এভাবে আত্মসমর্পণে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতন ভেদনীতি প্রয়োগ করে ধার্তরাষ্ট্রদের নিন্দা ও পাণ্ডবদের প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি মৃদুহেসে মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেনঃ মহারাজা দুর্যোধন! মহাপ্রাজ্ঞ ভরতবংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ, অসীম শক্তিধর ও বহুগুণের অধিকারী। যা ন্যায়সম্মত ও ধর্মানুমোদিত বলে সকলের বিশ্বাস, তুমি তার পরিপন্থী কার্য থেকে বিরত হও। ধীশক্তিসম্পন্ন সাধুব্যক্তির প্রবৃত্তি সব সময়ে ধর্ম ও সৎপথের দিকে প্রসারিত হয়, কিন্তু তোমার ঘৃণ্য কার্যকলাপে তার বিপরীত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তোমার পিতা মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, জননী গান্ধারী দেবী, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য

দ্রোণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, মহাত্মা বিদুর, অমাত্য সঞ্জয়, বল্মীকরাজ ও তাঁর পুত্র সোমদত্ত, তোমার সহোদর বিকর্ণ ও বিবিংশতি এবং তোমার মিত্র রাজন্যগণ সকলেই সন্ধি চান ; মহাবলশালী জ্ঞাতি পাণ্ডবদের সঙ্গে কেউই যুদ্ধে ইচ্ছুক নন। তুমি তোমার পিতামাতার বশবর্তী হয়ে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে, ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, প্রজারা সুখে থাকবে। যে প্রকৃত সুহৃদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তার বিপদ কেউ আটকাতে পারে না। তুমি চিরকাল কুচক্রী শকুনি, সূতপুত্র কর্ণ ও দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের পরামর্শে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ। তাঁরা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত মুখ বুঝে তা সহ্য করেছেন, একবারও তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি। সব কিছুরই একটা সীমা আছে, তুমি সেই সীমা লঙ্ঘন করে অনেকদূর এগিয়েছ। তুমি বারণাবতে জতুগৃহে তাঁদের জীবন্ত দগ্ধ করার চক্রান্ত করেছিলে। তুমি কপট দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের পৈতৃক অর্ধরাজ্য থেকে বঞ্চিত তো করেছ, এমন কি তাঁরা বাহুবলে যে সব রাজ্য জয় করে একদা নিজেদের রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেছেন; তাও অন্যায়-ভাবে অধিকার করে রেখেছ। তোমার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীরা কখনই পাণ্ডবদের পরাভূত করতে সক্ষম হবে না। একা ধনঞ্জয় যে মুহূর্তমধ্যে সবাইকে পরাজিত করতে পারে, তার পরিচয় তুমি মৎস্যদেশে পেয়েছ। সেই চির অপরাজেয় গাণ্ডীবীসহ সমস্ত পাণ্ডববাহিনীকে তোমার জয় করার ইচ্ছা দিবাস্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি ভুলে যেয়ো না, আসন্ন যুদ্ধে আমি অর্জুনের সারথ্যগ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি যার সহায়, যাকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প, যে আজও কারো কাছে পরাজিত হয় নি ; তোমার তাকে জয় করার বাসনা আকাশকুসুম কল্পনা-বিলাস মাত্র। নষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন ! এখনও সতর্ক হও। নইলে তোমার দোষেই সমগ্র কৌরবকুল বিনষ্ট হবে, প্রজাদের সুখশান্তি লঙ্ঘিত হবে, লোকে তোমাকে কুলঘ্ন বলবে। পাণ্ডবদের সঙ্গত অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করে তুমি অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে সুখে ও শান্তিতে বসবাস কর। অর্ধেক রাজত্ব যদি না দিতে চাও, তবে তাঁদের মানুষের মতন বেঁচে থাকার জন্য কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও তোমার ইচ্ছামত যে কোনও একটি গ্রাম—পাঁচ

ভাইকে মোট পাঁচটি গ্রাম প্রদান কর।

কৌরবশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম বাসুদেবের যুক্তিনিষ্ঠ উক্তিতে আনন্দিত হলেন। অন্নের জন্য কৌরবপক্ষে যোগদান করলেও তিনি বরাবরই পাণ্ডবদের বেশি পছন্দ করতেন। গভীর চক্রান্তে জালে জড়িয়ে পড়ে রাজ্যহারা হয়ে তাঁদের বনবাসের ও অজ্ঞাতবাসের অমানুষিক দুঃখকষ্ট ভোগে তাঁর অন্তর বেদনাতুর হয়ে উঠেছিল। যে বংশকে রক্ষা করার জন্য তিনি আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, আত্মকলহে সেই বংশের পরিণতির দৃশ্য কল্পনা করে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই কুরুপাণ্ডবের সন্ধির প্রস্তাবে তাঁর পরিপূর্ণ সম্মতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যে সেই কথা প্রতিফলিত হওয়ায় তিনি তা সমর্থন করে দুর্যোধনকে বললেনঃ বৎস দুর্যোধন! যদুপতি জনার্দন কৌরব ও পাণ্ডবদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যা বলেছেন, তুমি তার অন্যথা করো না। তুমি তার উপদেশ উপেক্ষা না করে তার কথা শোন। এতে তোমার ভাল হবে। তুমি পরম হিতৈষীর হিতকর বাক্য লঙ্ঘন করো না, কুচক্রীদের পরামর্শে কুলঘাতী হয়ো না, আত্মদম্ভে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠো না, পিতামাতাকে শেষ বয়সে নিষ্করুণ পুত্রশোকে নিমজ্জিত হতে দিয়ো না। পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য অর্ধেক রাজত্ব তাদের ফিরিয়ে দাও, তাদের সঙ্গে সন্ধি করে সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হও।

কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের কণ্ঠেও এই একই কথা প্রতিধ্বনিত হল। তিনি বললেনঃ বৎস! তুমি যাদবশ্রেষ্ঠ মধুসূদন ও কৌরবপ্রধান ভীষ্মের কথা অবহেলা করো না। এঁরা তোমাকে ধর্মসঙ্গত সদুপদেশই দিয়েছেন। যাদবসঙ্ঘের নবরূপকার শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে অপমান করো না। কেশব ও অর্জুন যে পক্ষে থাকবে, সে পক্ষকে মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও পরাভূত করতে পারবেন না। চিরঅজেয় কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে বিবাদ করে তুমি তোমার আত্মীয়বর্গ, মিত্র রাজন্যবৃন্দ, আশ্রিত নৃপতিদের ও প্রজাপুঞ্জের মৃত্যুর কারণ হয়ো না।

মহাত্মা বিদুরও সন্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন করে বললেনঃ দুর্যোধন! তুমি যে তোমার কুকর্মের উপযুক্ত কর্মফল ভোগ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি তোমার চরম পরিণতির কথা ভেবে শোক অনুভব করছি না, তোমার বৃদ্ধ ও অশক্ত পিতামাতার দুঃখের কথা চিন্তা করেই

ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তোমার কুকীর্তির জন্য শেষ বয়সে তাঁরা মিত্রহীন হয়ে পড়বেন এবং ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় তাঁরা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবেন। তোমার মতন কুলনাশক ও কুপুত্রকে জন্ম দেবার অপরাধে তাঁরা অগাধ ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিকারী হয়েও ভিক্ষুকেরও অধমভাবে দিন অতিবাহিত করবেন।

মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণ ও সমবেত প্রবীণদের কথায় ব্যাকুল হয়ে বললেন: পুত্র দুর্যোধন! মহামতি কেশবের উক্তি অত্যন্ত মঙ্গলকর, তোমার সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য এর থেকে উত্তম প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না। এতে তুমি তোমার অলব্ধ বিষয় লাভ করবে আর লব্ধ বিষয়ও রক্ষা করতে পারবে।

দুর্যোধন পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, কোনও কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির নিন্দাসূচক উক্তিতে তিনি ভেতর ভেতর এতখানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হতে বেশি বিলম্ব ঘটল না। অতিরিক্ত ক্রোধে তাঁর হিতাহিত জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হল। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ কথা খণ্ডন করতে না পেরে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: শ্রীকৃষ্ণ! পাণ্ডবদের প্রতি অস্বাভাবিক প্রীতির বশে তুমি বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছ! তুমি, পিতামহ, আচার্য ও ক্ষত্তা বিদুর—সকলের চোখে কেবল আমার দোষই ধরা পড়ে, তোমরা কেউ-ই পাণ্ডবদের দোষ দেখেও দেখতে চাও না। আমি অনেক চিন্তা করেও আমার এতটুকু অপরাধ কোথাও দেখতে পাই নে। পাণ্ডবেরা অতিমাত্রায় অক্ষক্রীড়াসক্ত, এই অতিরিক্ত আসক্তি তাদের অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করেছে। খেলায় হারজিৎ আছে। গান্ধাররাজপতি মাতুল শকুনি তাদের পরাজিত করে রাজ্য জয় করেছেন। তাদের হার না হয়ে আমারও পরাজয় ঘটতে পারত। তখন কিন্তু তুমি আমার হয়ে কথা বলতে না। প্রথমবারে বিজিত রাজ্য পিতার আজ্ঞায় পাণ্ডবদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। এতেও তাদের চৈতন্য হয় নি, আবার অক্ষক্রীড়ায় মেতে উঠেছে। দ্বিতীয়-বারেও তারা শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়েছে এবং রাজত্ব পরিত্যাগ করে বনবাসে গমন করেছে। তাদের বার বার পরাজয়ে আমার দোষ কোথায়?

তারা যদি খেলায় অপটু হয়, আমি কি করতে পারি? আমার এতে কোনও অপরাধ হয়েছে বলে আমি মনে করি নে। কিন্তু তারা এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে কৌরবদের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে। পাণ্ডবেরা তো দূরের কথা, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্রিত হলেও আমাদের উন্নত মস্তক অবনত করতে সমর্থ হবে না। ইচ্ছামৃত্যু অপরাজেয় ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য, অঙ্গাধিপতি কর্ণ ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরাভূত করা পাণ্ডবদের সাধ্যের বাইরে। আমরা মহাসমরে ক্ষত্রিয় বীরের চিরবাঞ্ছিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব, তবু শত্রুর কাছে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইব না। সমগ্র কৌরবরাজ্যের অধিপতি আমার পিতা, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এর একমাত্র অধিকারী। তুমি কেন পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্যের দাবি করছ, তা বুঝতে পারছি না। আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম বলেই পিতা একদা হস্তিনাপুরকে বিভক্ত করে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসনের অধিকার যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন। রাজঅমাত্যদের ও সভাসদদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ভীত হয়ে অন্ধপিতা যা করতে বাধ্য হয়েছেন, দেহে জীবন থাকতে আমি কখনই তা হতে দেব না। একবার যখন সমস্ত রাজত্ব আমার হস্তগত হয়েছে, তখন অর্ধেক রাজত্ব বা পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি গ্রাম তো পরের কথা, সুতীক্ষ্ন সূচাগ্রে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায়, তাও পাণ্ডবদের প্রত্যর্পণ করব না।

দুর্যোধনের অশিষ্ট উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সদাহাস্যযুক্ত প্রসন্ন মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর ভীতি উদ্রিক্ত করতে দ্বন্দ্বনীতির প্রয়োগ করে গম্ভীরভাবে বললেন ঃ দুর্যোধন! তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছ, তার তুলনা হয় না। এতদিন তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনদের মান্য করে তোমার সমস্ত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করেছেন, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। তোমার কার্যকলাপ তাঁদের সহ্যের শেষসীমা অতিক্রম করেছে। তুমি কৈশোরে তোমার পাপিষ্ঠ ভাইদের সাহায্যে অচেতন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছ। যৌবনে উপনীত হয়ে তুমি কুচক্রী শকুনির

পরামর্শে রাজকর্মচারী পুরোচনকে উৎকোচে প্রলুব্ধ করে বারণাবতে নানারকম দাহ্যবস্তু দিয়ে মনোরম জতুগৃহ নির্মাণ করে মহারাণী কুন্তী-দেবীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবকে অগ্নিদগ্ধ করে বধ করতে চেয়েছ। হস্তিনা-পুরের সিংহাসনে আরোহণ করে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডব-দের অগাধ ঐশ্বর্য ও প্রভূত সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পাপাত্মা শকুনিরই পরামর্শে কপট দ্যূতক্রীড়ায় ব্রতী হয়েছ। তুমি দুর্বৃত্ত দুঃশাসনকে পাঠিয়ে অন্তঃপুর থেকে প্রকাশ্য রাজসভায় রজস্বলা ভ্রাতৃ-বধূ পট্টমহারাণী দ্রৌপদীকে আনিয়ে লাঞ্ছিতা করেছ। সেখানে তুমি, সূতপুত্র কর্ণ আর ঘৃণ্য দুঃশাসন তাঁর প্রতি অনেক অশালীন মন্তব্য করেছ। এত করেও তৃপ্ত না হয়ে তুমিই তাঁদের রাজ্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদ অপহরণ করে বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছ। তুমিই তোমার পাপসঙ্গী শকুনি, কর্ণ আর দুঃশাসনের সঙ্গে যুক্তি করে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখিয়ে বনবাসী পাণ্ডবদের বিদ্রূপ করতে গিয়েছ। পাপিষ্ঠ! পাণ্ডবেরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সর্ত মেনে তের বছর বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দুঃখকষ্ট ভোগ করলেও তুমি সত্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের অপহৃত পৈতৃক অর্ধেক রাজত্ব অর্পণ করলে না। শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে বেঁচে থাকতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্য যে পাঁচটি গ্রাম দাবি করেছেন, তাও তুমি তাঁদের দিলে না। ঐশ্বর্যভ্রষ্ট কুলঘ্ন! তোমার এই অবিমিশ্রকারিতার জন্য শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে তোমাকে পাণ্ডবদের সর্বস্বই দিতে হবে।

দুঃশাসন দুর্যোধনের কাছেই ছিলেন। গতদিন তিনি, মাতুল আর দাদা তিনজনে মিলে রাজসভায় একাকী পেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করে পাণ্ডবদের জব্দ করার যে পরিকল্পনা করেছেন, তার চূড়ান্ত রূপ প্রদানের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত হয়েছিল। একে প্রথম থেকে দাদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কটূক্তি তাঁর ভাল লাগে নি, পরন্তু একটু একটু করে দেখতে দেখতে বসুদেবকে বন্দী করার সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি বিচলিত হয়ে বললেন ঃ দাদা! এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। এখুনি আমাদের শঠচূড়ামণি কেশবকে বন্দী করা উচিত। আর বেশি দেরি করলে উল্টো ফল ঘটতে পারে। আপনি যদি রাজসভায়

উপস্থিত থেকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজি না হন, তবে সে বাস্তববুদ্ধিহীন পিতার আদেশে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের সাহায্যে আপনাকে, আমাকে, মাতুলকে আর কর্ণকে বন্দী করে শত্রুদের হাতে তুলে দেবেন।

অকস্মাৎ চোখের সামনে অশনিসম্পাত হলে মানুষ যেমন হতচকিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, দুঃশাসনের উক্তিতে দুর্যোধনের প্রথমে সেই-রকম অবস্থা হল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে কিছু না বলে তখনই সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রেরা, সঙ্গী অমাত্যেরা আর অনুগত রাজারাও সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বাসুদেব দীর্ঘদিন ধরে দুর্যোধনের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। তাঁর নীচ মনোবৃত্তি, অকারণ আত্মম্ভরিতা ও যোগ্যতাহীন গগনস্পর্শী উচ্চাশার কথা সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি যেন তাঁর হঠকারিতাপূর্ণ এই চরম মুহূর্তের জন্যই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। রাজসভায় কি ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সমবেত মহারথী ও বীরবৃন্দ পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বাসুদেব সুদক্ষ রাজনীতিবিদের ন্যায় দুর্যোধনকে সকলের থেকে পৃথক করতে ভেদ-নীতি ও দ্বন্দ্বনীতি যুগপৎ প্রয়োগ করে সমবেত বীরবৃন্দকে সম্বোধন করে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেনঃ কৌরববংশীয় প্রবীণগণ ও বর্ষীয়ান মিত্রবৃন্দ! আপনারা অত্যন্ত গর্হিত কার্য করেছেন। আপনারা একজন দাম্ভিক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মূর্খকে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন, অথচ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সংযত ও ভদ্র হবার শিক্ষাপ্রদান করেন নি। আজ যা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তা আপনাদেরই অদূরদর্শিতার বিষময় ফল। বৃষবৃক্ষ যখন স্বেচ্ছায় রোপন করে পরমস্নেহে বর্ধিত করেছেন, তখন আপনাদেরই সকলের মঙ্গলের জন্য তার মূলচ্ছেদ করা কর্তব্য। নতুবা সনাতন কৌরববংশের ধ্বংস অনিবার্য। একটু আগে দুঃশাসন যা তার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে বলল, অনেকেই বোধ হয় তা শুনতে পেয়েছেন। আপনাদের আমি ঐ কাজই করতে বলছি। ক্ষাত্রসমাজকে রক্ষা করতে, সমগ্র দেশকে বাঁচাতে, প্রজাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং কুলনাশ বন্ধ করতে

দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে বন্দী করে আপনারা পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করুন। অথবা দুষ্টচক্রের নায়ক কেবলমাত্র দুর্যোধনকেই বন্দী করে পাণ্ডব করে অর্পণ করে সন্ধি করুন। কুলরক্ষার জন্য এক-জনকে, গ্রাম রক্ষার জন্য কুলকে, দেশরক্ষার জন্য গ্রামকে এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করা উচিত। দুরাত্মা মাতুল কংস তাঁর পিতা ভোজরাজ উগ্রসেনকে বন্দী করে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলে আমি তাঁকে বধ করে পুনরায় মাতামহকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাদববংশীয়েরা কংসকে পরিত্যাগ করে এখন মহারাজা উগ্র-সেনের রাজত্বে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মর্মান্তিক ভাষণে পুত্রস্নেহপ্রবণ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি অমাত্য বিদুরকে দূরদর্শিনী মহারাণী গান্ধারীদেবীকে রাজসভায় ডেকে আনতে আদেশ করলেন। রাজসভায় উপনীত হয়ে মহারাণী অন্ধরাজার কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে পেরে পুত্রদের দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য স্বামীরই নিন্দা করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিদুর পুনরায় দুর্যোধনকে রাজসভায় নিয়ে এলে গান্ধারীদেবী তাঁকে অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু তাতে কোনও ফলোদয় হল না। দুর্যোধনের ইঙ্গিতে দুঃশাসন সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে অগ্রসর হতেই সহসা দৃশ্যপটের বিরাট পরিবর্তন ঘটল। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন সাত্যকি প্রভৃতি নয়জন যাদব মহারথী সশস্ত্রভাবে ব্যূহরচনা করে শ্রীকৃষ্ণের তিনদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন ও মহারথী কৃতবর্মা রাজসভার প্রবেশদ্বার এমনভাবে আগলে রয়েছেন যে কারো পক্ষে বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করা বা ভিতর থেকে বাইরে প্রস্থান করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সবাই আরো লক্ষ্য করল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী যাদবগণ মুহূর্তমধ্যে ছদ্মবেশ পরিহার করে প্রত্যেকে সশস্ত্র সৈনিকে পরিণত হল এবং রাজসভার প্রবেশদ্বার, সম্মুখের প্রাঙ্গণ ও রাজপথ সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করে ফেলল। অবস্থা দেখে দুঃশাসন সঙ্গী সৈনিকদের নিয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন. তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস করলেন না। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় ধার্তরাষ্ট্রেরা, শকুনি ও অন্যান্য পাপানুচরেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং সমবেত প্রবীণ কৌরবগণ, বয়স্ক রাজঅমাত্য

সভাসদগণ, মিত্র ও আশ্রিত রাজন্যবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই এত বিহ্বল হয়ে গেলেন যে এখন কি করে সব দিক রক্ষা করবেন ; তা স্হির করতে না পেরে স্হানুর মতন নিশ্চল হয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুর্যোধন ও তাঁর অনুগামী পাপচক্রের সঙ্গীদের উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। নিদারুণ ক্রোধে তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল কৃষ্ণাভ বদনমণ্ডল গম্ভীর ও রক্তিমাভ হয়ে গেল, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে অগ্নি-বর্ণ হয়ে উঠল, বক্ষস্হল স্ফীত ও আন্দোলিত হতে লাগল, ভীষণ শব্দে নিঃশ্বাস বায়ু বহির্গত হল ও দেহের মাংস পেশীসমূহ পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেল। তিনি বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় প্রবল অট্টহাস্য করে উঠলেন, তাঁর প্রলয়ঙ্কর অট্টহাসিতে সমগ্র রাজসভা থর থর করে কম্পিত হতে লাগল। সভাস্হ সকলে যার-পর-নাই ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। সমস্ত কার্যের কেন্দ্রীয়পুরুষ দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গীদের ভীতির আর অবধি রইল না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় চেদিপতি শিশুপাল বধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রুদ্রমূর্তি তাঁর স্মৃতিপটে জাগরিত হল। বাসুদেব প্রচণ্ড গর্জন করে বলতে লাগলেন ঃ দুর্বৃত্ত দুর্যোধন! তুমি মূর্খের ন্যায় ধারণা করেছ যে আমি বীরশূন্য ও শক্তিহীন হয়ে তোমার এই পাপ রাজসভায় এসেছি। তাই আমাকে দুর্বল মনে করে সবলে বন্দী করতে সাহসী হয়েছ। শক্তি আর ক্ষমতা যদি থাকে, তোমার যাবতীয় সৈন্যসামন্ত ও রথীদের নিয়ে এখুনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দুর্মতি কৌরবদের আমি একাই যমালয়ে প্রেরণ করতে পারব, এজন্য পাণ্ডবদের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন হবে না। তাঁদের পরিশ্রমও এতে অনেকটা লাঘব হবে। পাপিষ্ঠ! সাহস আছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার?

শ্রীকৃষ্ণ পরে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে আত্মক্রোধকে সংযত করলেন। তিনি ক্রমশ শান্তভাব ধারণ করে পূর্বেকার রূপ পরিগ্রহ করলেন। মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ মহারাজ! আপনি আপনার মন্দমতি পুত্রদের ঘৃন্য ব্যবহার প্রত্যক্ষ করলেন। ক্ষত্রিয়সমাজে রীতি অনুযায়ী দূত অবধ্য ও তাঁর অপরাধ মার্জনীয়। কিন্তু আপনার নষ্টকীর্তি পুত্রেরা বিনা প্ররোচনায়

সকলের সামনে আমাকে বন্দী করতে উদ্যোগী হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে এদের সবাইকে হত্যা করে পাণ্ডবদের চিরদিনের জন্য নিষ্শত্রু করতে পারি। তাতে অনায়াসে তাঁদের কার্যোদ্ধার হবে ও হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার ঘটবে। কিন্তু আমি দূত হয়ে আপনার সম্মুখে কোনও নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান ঘটতে দেব না। আপনার পুত্রেরা যখন সন্ধিতে অনিচ্ছুক ও পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য পুনরায় অর্পণ না করার জন্য বদ্ধ-পরিকর এবং আপনিও তাদের সেই সৎকার্যে প্রবৃত্ত করতে অপারগ, তখন আমার এখানে থাকা না থাকা একই কথা। আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দিন, আমি উপপ্লব্য নগরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যাই। কৌরবদের ধ্বংস অনিবার্য। ভবিতব্যের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

অবস্থা বুঝে সারথি দারুক আগেই রথ প্রস্তুত করে কৌরব রাজসভার দ্বারদেশে এনে রেখেছিল। যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ সকলের অনুমতি নিয়ে মহারথী সাত্যকি আর ধর্মাত্মা বিদুরের হাত ধরে রাজসভা পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি রথে আরোহণ করে প্রস্থানের জন্য উদ্যত হতেই মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র আর্তনাদ করে বলে উঠলেন: জনার্দন! আমি দৃষ্টিহীন, অশক্ত ও পরনির্ভরশীল। তুমি এই অক্ষম রাজার ওপর রাগ করো না। দুর্মতি পুত্রেরা আমার কথা শোনে না, তারা আমার বাধ্য নয়। আমি কুরুপাণ্ডবের সন্ধির জন্য যে কতখানি আগ্রহী, তা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলে। বৎস যুধিষ্ঠিরকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে বুঝিয়ে বলো, পরস্পরের সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমি এখনও সন্ধি চাই।

বাসুদেবের ইঙ্গিতে সারথি দারুক অশ্বসমূহের বল্গা আকর্ষণ করল। রথ উল্কার বেগে স্থানত্যাগ করে গন্তব্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলল। যাদব মহারথীরা সমতালে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং অন্যান্য যাদবগণ তাঁদের পিছন পিছন চলতে লাগল।

॥ বার ॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য দুর্যোধনের জঘন্য চক্রান্তে ব্যর্থ হবার পরে পাণ্ডবদের আর কৌরবদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না। পরন্তু এই দৌত্য উভয় পক্ষের মহাসমরকে আরো ত্বরান্বিত করে তুলল। উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বাসুদেব দুটি কাজ করলেন। প্রথমে তিনি অমাত্য বিদুরের গৃহে উপনীত হয়ে পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীকে কৌরব রাজসভার সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করে পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে চাইলেন। কুন্তীদেবীর পুত্রেরা ও পুত্রবধূ দীর্ঘকাল অশেষ দুঃখকষ্ট উপভোগ করায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপর অভিমন্যু ও উত্তরা প্রণাম করতে গেলে পট্টমহারাণী ভানুমতীর বিগত দিনের নির্মম ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপ তখনো তাঁর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কাপুরুষের মতন পরনির্ভরশীল জীবনধারণ না করে তিনি বরাবরই ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেই লক্ষ্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হলেন না। পুত্রদের আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে তিনি কেবলমাত্র যুদ্ধের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেই নিরস্ত হলেন না, বাসুদেবের মাধ্যমে তিনি পুত্রদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টারও ত্রুটি করলেন না।

পরে শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর কর্ণের সঙ্গে সৌজন্যমূলক গোপন সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর এই মিলন ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কর্ণ ছিলেন প্রচণ্ড পাণ্ডববিদ্বেষী। তিনি তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে বাল্যকাল থেকে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। অর্জুনের প্রতি এই বৈরমনোভাবই তাঁকে দুর্যোধনের ঘনিষ্ঠ মিত্র করে তুলেছিল। কর্ণের জন্ম চির রহস্যাবৃত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তা অজ্ঞাত ছিল না। তিনি সূতদম্পতি অধিরথ ও রাধার পুত্র বলে পরিচিত হলেও তাঁরা ছিলেন

তাঁর পালক পিতামাতা মাত্র। আসলে তিনিও ছিলেন অর্জুনের মতই কুন্তীদেবীর পুত্র—সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। তবে তিনি পাণ্ডবদের ন্যায় তাঁর বিবাহোত্তরকালের পুত্র নন, প্রাক্‌বিবাহ কুমারীকালীন কালীনপুত্র। তাই তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগ্লাণিতে লোকলজ্জার ভয়ে জননী তাঁকে একটি আধারে করে নদীবক্ষে জলে ভাসিয়ে দেন। সূতদম্পতি জল থেকে তুলে তাঁকে লালনপালন করায় তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ কৌন্তেয় হয়েও আজ সূতপুত্র ও রাধেয় নামে সকলের কাছে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল কর্ণকে মাতৃপরিচয় প্রদান করে তাঁর প্রবল অর্জুনবিদ্বেষ বিনষ্ট করা আর আসন্ন মহাযুদ্ধে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসা। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাফল্যঅর্জন করতে সমর্থ না হলেও এ ব্যাপারে তিনি যে অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছেন সন্দেহ নেই। কর্ণ শত প্রলোভনেও বহুদিনের বন্ধু দুর্যোধনকে অসময়ে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন বটে, তবু পাণ্ডবেরা সহোদর জেনে তাঁর প্রবল পাণ্ডববিরোধিতা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হল। তিনি অন্যান্য পাণ্ডবদের পরিহার করে একমাত্র অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথযুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহবর্জিত কুন্তী-দেবীর অযৌক্তিক আচরণে প্রচণ্ড অভিমানে তাঁর চিত্তবিক্ষোভ দেখা দিল। জননীর পরিচয় অবগত হয়েও তিনি তাঁকে যথোচিত স্বীকৃতি দিতে পারলেন না, দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষে তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সুগভীর হতাশায় তাঁর অবাঞ্ছিত জীবনধারণ দুর্বহ হয়ে উঠল। জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষে আর বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে মনে হল।

কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের লোমহর্ষক মহাযুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত হিরণ্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বিশাল কুরুক্ষেত্র প্রান্তরকে পূর্বেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল সমন্তপঞ্চক। কুরুক্ষেত্র আবহমানকাল ধর্মক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছে। সমকালের মানুষ এই স্থানকে দেবতাদের পবিত্র যজ্ঞভূমি বলে বিশ্বাস করত। একুশবার সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য

করে জমদগ্নিপুত্র বীর্যবান তেজস্বী তাপস পরশুরাম স্বর্গত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্য করে এখানেই পিতৃতর্পণে ব্রতী হয়েছিলেন। কথিত আছে, ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা চক্রবর্তী ভরতের পূর্বপুরুষ যযাতিপুত্র মহারাজা কুরু এই পুণ্যভূমিতে হলকর্ষণ করে বরপ্রাপ্ত হন যে এখানে তপস্যা করতে করতে যিনি পরলোকগমন করবেন অথবা ক্ষত্রিয়সমাজের অতিপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠান শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রাণ বিসর্জন দেবেন, তিনি ইহজগৎ পরিহারের পরে অক্ষয় স্বর্গলাভের অধিকারী হবেন। তখন থেকেই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কুরু স্বয়ং পরিণত বয়সে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে এখানে শেষজীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরের প্রতি ক্ষত্রিয়সমাজ চিরদিন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করত। এই আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক ও পুরুষানুক্রমিক পরম্পরাগত। ক্ষত্রিয়ের চিরবাঞ্ছিত সম্মুখসমরে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই কৌরবদের ও পাণ্ডবদের আসন্ন ভারতযুদ্ধে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে রণভূমি হিসাবে বেছে নিতে প্রলুব্ধ করেছিল।

শত্রুর মুখোমুখি প্রবল সংঘর্ষে জীবনমৃত্যুর লুকোচুরি খেলার ন্যায় কুরুক্ষেত্রের নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যেও যেন তার প্রতিচ্ছবি সতত দীপ্যমান। প্রকৃতির অভ্যন্তরেও যেন জীবন আর মৃত্যু পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। কুরুক্ষেত্রের পরিত্যক্ত বিশাল প্রান্তর স্থির, নিশ্চল ও চিরান্ধকারময় মৃত্যুর দ্যোতনা করছে। তাই প্রান্তরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ধু ধু করছে মরুভূমির মতন, কোথাও জনবসতি বা জীবনের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। এরই পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সর্বদা কলহাস্যমুখরা হিরণ্বতী নদী। প্রখর দাবদাহে গ্রীষ্মের শুষ্কতা এখন অন্তর্হিত, বর্ষণসিক্ত বর্ষাস্ফীত জলস্রোতের প্রচণ্ড গর্জন অনুপস্থিত, শরতের রৌদ্রমেঘের আবর্তনে আবৃত প্রবল প্রবাহ নেই বা জরাগ্রস্ত শীতের স্থবিরত্বের স্পর্শে শীর্ণকায়া হয়ে ওঠে নি; হেমন্তঋতুর স্বচ্ছ জলধারার কুলু কুলু ধ্বনি প্রকৃতির স্তব্ধতাকে চিঁড়ে চিঁড়ে খান খান করে দিচ্ছে। এই প্রবহমানতাই তার জীবনের প্রতীক, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অস্তিত্বের পরিচায়ক।

শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাবর্তন করে পঞ্চ পাণ্ডবকে তাঁর দৌত্যের বিষদ বিবরণ জানালেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বললেন না। সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন: মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের জন্য আমি সাম, দান ও ভেদনীতির প্রয়োগ করে নানাভাবে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,—কোন-প্রকার ফলোদয় হয় নি। প্রথম নীতি তিনটি নিষ্ফল হওয়ায় এখন চতুর্থ দণ্ডনীতির প্রয়োগ করা ভিন্ন অন্য আর কোনও উপায় নেই। বিনা-যুদ্ধে দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন আপনাকে অর্ধেক রাজত্ব তো দূরের কথা, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদানে অসম্মত। আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। কয়েকদিনের মধ্যেই কৌরবসৈনেরা যুদ্ধের অভিলাষে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করবে, আপনি তার আগেই সেখানে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

যুধিষ্ঠির সমস্ত কথা শুনলেন। তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠল, তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন: কেশব! এ যুদ্ধ আমি চাই নি, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ-পর্যন্ত আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হল। তোমার কাছ থেকে একটা বিষয় জানার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে। আশা করি, মহাযুদ্ধের আগে জীবনমৃত্যুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি আমার সে অভিলাষ পূর্ণ করবে। যাঁদের আমি পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন বলে মনে করি, হস্তিনাপুরের রাজসভায় তাঁদের আচরণ দেখে তোমার কি ধারণা হল?

শ্রীকৃষ্ণকে সরাসরি প্রশ্ন করে যুধিষ্ঠির উত্তরের প্রত্যাশায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্যান্য পাণ্ডবেরাও তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। যত সহজে অল্প কথায় যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, তত সহজে বাসুদেবের পক্ষে উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। ধর্মরাজ তাঁকে মারাত্মক প্রশ্ন করেছেন। তাঁর কথার সামান্য এদিক-ওদিক ঘটলে পূজনীয় ব্যক্তিদের অমূলক নিন্দা বা অকারণ প্রশংসা করা হবে, সত্য-

নির্ণয়ে যা আদৌ কাম্য হওয়া সমীচীন নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষ
গভীর চিন্তা করে ধীরে ধীরে বললেনঃ মহারাজ! একমাত্র মহাত্ম
বিদুর ব্যতীত সকলেই অল্প-বিস্তর দুর্যোধনের প্রতি পক্ষপাত দো
দুষ্ট। নিজেদের জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, সবাই তা
অন্যায় কাজকে সমর্থন করে চলেছেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুপাণ্ডবে
সংঘর্ষ এড়াতে সন্ধি চান বটে, তবে তা পুত্রদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে
অর্ধেক রাজ্য তোমাদের ফিরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা তাঁর নেই
মহারাণী গান্ধারীদেবী পুত্রদের কোনও অন্যায় সমর্থন না করলেও
তিনি দুর্বলা রমণী মাত্র। মদগর্বী পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর কোনও
কিছু করার ক্ষমতা নেই। পিতামহ ভীষ্ম বা আচার্য দ্রোণের আপনাদে
প্রতি আকর্ষণ আর স্নেহের অভাব নেই সত্যি, কিন্তু তাঁরাও দুর্যোধনে
অসঙ্গত কাজকর্মের প্রতিবাদে সোচ্চার নন। পরন্তু একটু লক্ষ
করলেই দেখতে পাবেন, তাঁরা অন্নঋণের দোহাই দিয়ে বরাবর তার অন্যা
কাজকেই সমর্থন করে চলেছেন। তাঁরা যদি এর তীব্র প্রতিবাদ করতেন
বিশেষ করে ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রাপ্ত ভীষ্ম যদি জ্ঞাতিবিরোধে এক পক্ষকে
অবলম্বন না করে নিরপেক্ষ হয়ে দূরে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে কুরুক্ষেত্রে
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে রক্তক্ষয়ী মহাসমর কখনোই অনুষ্ঠিত হত কিনা
সন্দেহ। এঁদের পরোক্ষ সমর্থনই কৌরবদের দম্ভকে বাড়িয়ে তুলেছে
দুর্যোধন অবশ্য এঁদের চেয়ে কর্ণের বীরত্বের উপরেই বেশি আস্থাবান
তার ধারণা কর্ণ একক বীর্যবত্তায় তাকে জয়মাল্যে ভূষিত করবে। তবে
ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য যদি তার হয়ে যুদ্ধ করতে রাজি না
হতেন, তবে সে কেবলমাত্র মাতুল শকুনি, ভ্রাতা দুঃশাসন ও সখা কর্ণের
ষড়যন্ত্রে এতখানি বাড়াবাড়ি করতে পারত না।

গুরুজনদের ব্যবহারে আসন্ন মহাযুদ্ধের কথা চিন্তা করে
যুধিষ্ঠিরের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি গভীর আন্তরিকতার
সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করে বললেনঃ জনার্দন! আমি হতভাগ্য। আমিই
এই ভয়ংকর যুদ্ধের কারণ। যাঁরা অবধ্য, যাঁদের স্নেহ ও ভালবাসায়
আমাদের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে, যাঁদের দেখলে পরম
শ্রদ্ধায় আপনাআপনি মাথা নত হয়ে আসে; ভাগ্যদোষে তাঁদের সঙ্গে
আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদের নিষ্করুণ অস্ত্রাঘাতে

র্জরিত করতে হবে। তাঁদের বধ করতে না পারলে আমাদের জয়লাভের আশা নেই। মধুসূদন! আমি কেমন করে প্রণম্যদের নির্মমভাবে হত্যা করব?

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজের আত্মিকবেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। অন্যের বেদনায় তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি সান্ত্বনাপ্রদান করে ধীরে ধীরে বললেনঃ দাদা! আপনি কখনও ধর্ম, ন্যায় ও সত্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি; কখনও অন্যায়, অসঙ্গত ও যুক্তিহীন কোনও কাজ করেন নি। সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আপনি ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। আপনি সেই ধর্মপথেই চলবেন। যা ভবিতব্য, তা হবেই। এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, আপনি কুরুক্ষেত্রে সেই ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ করুন।

অন্যান্য পাণ্ডবেরা সকলেই বাসুদেবের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন এবং যুদ্ধের জন্য ধর্মরাজকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ভাইদের লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে বললেনঃ তোমাদের মতন কেশবের সঙ্গে আমিও একমত। এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়া যে ক্ষাত্রধর্মের প্রতিকূল, তাও আমার অজানা নয়। তবু জ্ঞাতিবিরোধের কথা স্মরণ করে ও বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে বিললিত হয়ে পড়ি।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চিত্তদৌর্বল্যকে কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। সবাইকে আহ্বান করে তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেনঃ শোন! কেশবের কাছ থেকে তোমরা সব কথা শুনলে। যুদ্ধ ছাড়া আর যখন কোনও উপায় নেই, তখন যুদ্ধের জন্য সবাই তৈরি হও।— আমাদের মোট সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হয়েছে এবং তাদের সাতজন সর্বসম্মত সেনাপতি ঠিক হয়েছে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, মৎস্যাধিপতি বিরাট, চেদিশ্বর ধৃষ্টকেতু, মগধপতি সহদেব, যাদবপ্রধান সাত্যকি দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী। এঁরা সবাই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, অসমান্য বীরত্ব ও নির্ভীক চিত্তের অধিকারী এবং আমাদের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এই সাতজন সেনাপতির মধ্যে কাকে তোমরা প্রধান সেনাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে কর? এমন ব্যক্তির নাম করবে, যিনি সমস্ত সৈন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত

করতে জানেন এবং যুদ্ধকালে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণের ন্যা
মহারথীদের প্রতাপ সহ্য করতে পারেন। এক এক করে তোমর
তোমাদের মতামত ব্যক্ত কর ?—আচ্ছা সহদেব ! তুমিই প্রথমে বল ?

সহদেব ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের প্রায় সঙ্গে সং
বললেন ঃ আমাদের বৈবাহিক মৎস্যরাজ বিরাটকেই আমি যোগ্যতম ব্যা
বলে মনে করি। ইঁনি আমাদের বর্তমান সুখদুঃখের সাথী, মহাবলবা
ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ। এঁর সাহায্যে ও পরামর্শে আমরা অনায়াসে রাজ
উদ্ধার করতে সক্ষম হব।

নকুলও সহদেবের কথা শেষ হতে-না-হতেই তৎক্ষণাৎ বললেন
আমাদের পূজ্যপাদ শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদই প্রধান সেনানায়ক
হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বয়েস ও কুলমর্যাদা—দু'দিক থেকে
শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তাঁর অস্ত্রগুরু। তিনি
আচার্য দ্রোণের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গেও তিনি প্রতি
যোগিতা করার স্পর্ধা রাখেন। দ্রোণাচার্যকে বিনাশের জন্য সপত্নীক
তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করে কনিষ্ঠদের বক্তব্য শুনছিলেন। কারো
নির্বাচনই তাঁর মনঃপুত হল না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ঃ আমি
মহারাজা দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি হিসাবে বরণে
উপযুক্ত বলে মনে করি। তিনি আমাদের নিকট আত্মীয়। পাঞ্চাল
রাজদম্পতির দীর্ঘকাল তপস্যার প্রভাবে, ঋষিদের আনুকূল্যে ও দৈবে
অনুগ্রহে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি দ্রোণাচার্যের হত্যাকারীরূপে
চিহ্নিত হয়েছেন।

মহাবল ভীমসেনের কাছে কারো মনোনয়নই ঠিক হয়েছে বলে মনে
হল না। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন ঃ মহারাজা দ্রুপদের পুত্র অনিন্দ্য
কান্তি শিখণ্ডীই ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ। আমার মতে
সবাইকে বাদ দিয়ে তাঁকেই প্রধান সেনাপতি করা উচিত।

প্রধান সেনাপতি মনোনয়ন নিয়ে চার ভাইয়ের মতবিরোধে যুধিষ্ঠির
বিব্রতবোধ করলেন। কেউ কারো মত পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন না।
সকলেই নিজেদের মতের সপক্ষে নানারকম যুক্তির অবতারণা করতে
লাগলেন। অনন্যোপায় হয়ে যুধিষ্ঠির শেষে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন ঃ মধু

সূদন! আমার কনিষ্ঠদের একজনের নামের সঙ্গে আর একজনের নামের মিল হচ্ছে না। যাঁদের নাম তারা করছে, সবাই আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাই এ নিয়ে বেশি বাদানুবাদ সঙ্গত নয়। তুমিই আমাদের কাছে সকলের অপেক্ষা প্রিয়। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আত্মীয় ও পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকার কাজকর্মের মূল উৎস। আমাদের সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, রাজ্যসম্পদ ও জীবনমৃত্যু সবই তোমার অধীন। তাই আমি তোমাকেই প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আজ আর রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই। কাল প্রত্যূষে আমারা অধিবাসের পর রক্ষাসূত্র ধারণ করে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে সসৈন্যে যাত্রা করব। মাধব! এখন তুমি তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথায় গভীর আত্মতৃপ্তি অনুভব করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর তিনি অর্জুনের দিকে কটাক্ষ করে উত্তর দিলেন: মহারাজ! আপনার অনুজেরা যে চারজন ব্যক্তির নাম এখানে উপস্থিত করেছেন, তাঁরা সবাই প্রধান সেনানায়ক হয়ে সৈন্য পরিচালনায় সক্ষম। তবে সর্বদিক বিবেচনা করে আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই মনোনীত করছি। মহারাজ! আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এও ঘোষণা করছি, আপনার স্বপক্ষে যে সব মহাবল বীরযোদ্ধা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরব-দের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পাণ্ডবেরা আনন্দিত হয়ে হর্ষপ্রকাশ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথমে দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, সহদেব ও শিখণ্ডীকে যথারীতি অভিষিক্ত করে সেনাপতির পদ প্রদান করলেন। তারপর তিনি ধৃষ্ট্রদ্যুম কে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ করে অর্জুনকে সর্ব সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁর উপর সমস্ত সেনাপতি পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের নিয়ন্তা ও সারথিপদে বৃত করে যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হলেন।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হল। সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের কলকোলাহলে, হস্তীর বৃংহণে, অশ্বের হ্রেষায়, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে, শঙ্খদুন্দাভি ও শিঙার নিনাদে দশদিক পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। প্রচণ্ড তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায় সেই বিশাল সৈন্য-

বাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। পাণ্ডবেরা সমগ্র বাহিনীকে তিনটি দলে বিভক্ত করে উৎফুল্লচিত্তে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের উন্মুক্ত প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতিকে নিয়ে যুধিষ্ঠির সৈন্যদের মধ্যভাগ দিয়ে যাত্রা করলেন। শকট, অস্ত্রশস্ত্র, কোষাগার, ভোজ্যদ্রব্য, ইন্ধন, ভারবাহীরা, ভৃত্যেরা, অসুস্থ ব্যক্তিরা, চিকিৎসকেরা প্রভৃতি তাঁর পিছন পিছন চলল। পট্টমহারাণী দ্রৌপদী অন্যান্য পাণ্ডব পুরমহিলা ও দাসদাসী নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর উপরেই এখানকার দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। ঠিক হল, প্রয়োজন অনুসারে ধর্মরাজ ডেকে পাঠালে বা ইচ্ছা করলে মাঝে মাঝে দ্রৌপদী ও সুভদ্রা উত্তরাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবশিবিরে যেতে পারবেন।

পাণ্ডববাহিনী যথাসময়ে কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে উপনীত হল। যুধিষ্ঠির দেবালয়, তীর্থস্থান, সাধুদের আশ্রম ও শ্মশানভূমি সযত্নে পরিহার করলেন। হিরণ্বতী নদীর তীরে পবিত্র কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের পশ্চিমদিকে পর্যাপ্ত বৃক্ষ ও তৃণাচ্ছাদিত সমতল স্নিগ্ধ স্থান তিনি সেনা-সমাবেশের জন্য মনোনীত করলেন। সেখানে নানা আকারের অসংখ্য শিবির স্থাপন করা হল এবং তিনদিকে পরিখা খনন করে নদীর সঙ্গে যুক্ত করে শিবিরগুলিকে শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে মুক্ত করা হল। প্রত্যেক শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, ভোজ্যদ্রব্য, ইন্ধন, পানীয় জল, তৃণ প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা করা হল।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর পরিত্যাগের পর কুরুপাণ্ডবের মহাসমর নিকট-বর্তী হয়ে উঠেছে দেখে মহারাজা দুর্যোধন চিন্তিত হলেন। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ডেকে তিনি তাঁর চিন্তার কারণ ব্যক্ত করলেন। সকলে তাঁকে যুদ্ধের জন্য বার বার উৎসাহিত করতে লাগলেন। সবার পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুর্যোধনের হৃদয় অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি আত্মদম্ভে মত্ত হয়ে বললেন : মাতুল আর তোমাদের ভরসাতেই আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, ও কৃপ যাই বলুন না কেন ; যুদ্ধে বিজয় সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ

নেই। পাণ্ডবেরা ভীত হয়েই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। বাসুদেব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে ভেবেছিল যে পাণ্ডবহিতৈষী পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ আর ক্ষত্তা বিদুরের সাহায্যে বৃদ্ধ পিতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আমাকে সন্ধি করতে বাধ্য করবে। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। সে বরাবরই আমার সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে। সে যুদ্ধের পক্ষপাতী, এখনও নিশ্চয় সে যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদের উত্তেজিত করবে। উদরসর্বস্ব ভীমসেনের আর তার প্রিয়সখা অর্জুনের নিজেদের কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। বাসুদেব তাদের যেমন চালায়, তারা তেমনি চলে। দ্রুপদ আর বিরাটের সঙ্গেও আমার শত্রুতা অনেকদিনের, একজন পাণ্ডবদের শ্বশুর আর একজন বৈবাহিক। তাঁরাও কেশবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে কৌরবদের ও পাণ্ডবদের মধ্যে লোমহর্ষক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। মাতুলের সঙ্গে পরমর্শ করে তোমরা সবাই তৎপর হয়ে সেই মহাযুদ্ধের প্রাথমিক সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত কর। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তোমরা হাজার হাজার ছোট বড় অগণিত শিবির স্থাপন কর। এমনভাবে এদের নির্মাণ করাবে, যাতে শত্রুরা বাইরে থেকে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনার পথ অবরুদ্ধ করতে না পারে। শিবিরের মধ্যে পানীয় জল, ভোজ্যদ্রব্য, ইন্ধন, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিরও প্রাচুর্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

দুর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের পূর্বদিকে কৌরবদের অসংখ্য শিবির স্থাপন করা হল। তিনি তাঁর সংগৃহীত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অক্ষৌহিণী সৈন্যের পরিচালনার দায়িত্ব এক একজন সেনাতির উপর ন্যস্ত করলেন। তিনি প্রথমে আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, মদ্রাধিপতি শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কম্বোজপতি সুদক্ষিণ, অঙ্গাধিপতি কর্ণ, ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, গান্ধারনরেশ শকুনি. বাহ্লীকরাজপুত্র সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা—এই এগার জনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পরে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রচুর আনন্দ, তুমুল উল্লাস ও প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সকলের যথারীতি অভিষেক ক্রীড়া সমাপ্ত হল। তারপর প্রধান সেনানায়ক মহারথী ভীষ্মের নেতৃত্বে এগারজন সেনাপতিসহ সমগ্র

কৌরববাহিণী কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যাত্রা করলেন। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগর্তনৃপতি সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা, কৌশলরাজ বৃহদ্‌বল, মাহিষ্মতীর রাজা নীল, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, মধুবংশীয় জলসন্ধ, রাজা পৌরব, গান্ধারনিবাসী অচল ও বৃষক প্রভৃতি রথী ও মহারথীরা সেখানে উপস্থিত হলেন।

অঙ্গরাজ কর্ণের অহঙ্কারপূর্ণ উক্তিতে কুরুবৃদ্ধ প্রধান সেনাপতি ভীষ্ম উপহাস্য করে উঠলেন। তারপর ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে তাঁকে সকলের সামনে বললন: আত্মম্ভরি কর্ণ! এই অহঙ্কার তোমারই স্বভাবের উপযুক্ত। আমি তোমাকে অর্ধরথ বলায় তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তোমার চরিত্র পদে পদে প্রমাণ করছে যে তুমি সেই অর্ধরথ হবারও যোগ্যতা অর্জন কর নি। আমি যেখানে সমস্ত পাণ্ডববাহিনী সংহারের জন্য এক মাস সময় নিয়েছি, অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্য ঐ একই সময় চেয়েছেন, বিখ্যাত শস্ত্রবিশারদ কৃপাচার্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করেছেন এবং আচার্যপুত্র অধিরথ অশ্বত্থামা দশদিন সময় চেয়েছে; তুমি কি করে তা পাঁচদিনে নিহত করবে বললে? তোমার এই অহেতুক আত্মম্ভরিতাই তোমার পতনের কারণ হবে।

সকলের সামনে মহামতি ভীষ্মের এভাবে সুতীব্র ব্যঙ্গোক্তির প্রয়োগে মহাবীর কর্ণ ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড ক্রোধানলে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল ও বক্ষস্থল স্ফীত হয়ে দ্বিগুণিত আকার ধারণ করল। তিনি গম্ভীরভাবে ভীষ্মকে বললেন: সেনাপতি ভীষ্ম! এখনও যুদ্ধ শুরু হয় নি। শত্রুসৈন্য যুদ্ধসূচনার জন্য সামনে অপেক্ষা করছে। এ সময়ে আত্মকলহ অনুচিত, নইলে দ্বৈরথযুদ্ধে আজই আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। আপনি সর্বদা নিজেকে অধিরথ বলে বড়াই করেন। কিন্তু আপনার উক্তি যে কতদূর মিথ্যা, সবাই তার প্রমাণ পেয়ে সুখী হত। আমি আগেই বলেছি, আবারও বলছি—আপনার মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবেরা আমার শক্তির পরিচয় পাবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না, দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন।

কুরুক্ষেত্রের কৌরবশিবিরে যুদ্ধের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার পরিসমাপ্তি অত্যন্ত বিসদৃশভাবে ঘটলেও এর সূচনা খুব সঙ্গত কারণেই হয়েছিল। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি মহারথী বিশেষ করে মহাবীর কর্ণ কৌরবপক্ষে যোগদান করায় যুদ্ধময় সম্বন্ধে দুর্যোধন নিশ্চিত হলেও পাণ্ডবশিবিরে সৈন্যদের উল্লাসধ্বনি মাঝে মাঝে তাঁকে বিচলিত ও চিন্তিত করে তুলল। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কর্ণের সাক্ষাতে তিনি পরম সমাদরে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে বললেনঃ পিতামহ! আপনি আমার প্রধান সেনাপতি। আপনি এই মহাযুদ্ধের নেতৃত্বে অভিষিক্ত। আপনি চির অপরাজেয়। আজ পর্যন্ত কেউ আপনাকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারেন নি। পূজ্যপাদ পিতা মহারাজা শান্তনুর আশীর্বাদে মৃত্যুও আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছে। আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র আপনাদের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী অগণিত মহাধনুর্ধরই নেই, সৈন্যসংখ্যার দিক থেকেও আমরা বলবান— আমাদের যেখানে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, পাণ্ডবদের সেখানে মাত্র সাত। পিতামহ! আমাদের অগণিত মহারথী ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনি কত দিনে পাণ্ডববাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবেন?

দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্যতম হোতা। তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও অনমনীয় জিদে এই রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের সূচনা হতে চলেছে। কৌরবদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের তিনি অধিপতি ও স্বৈরতান্ত্রিক নায়ক। তাঁরই পতাকা তুলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মহাবল রাজন্যবৃন্দ ও শক্তিমান রথী মহারথীদের সমাগম ঘটেছে। তাই তাঁর পক্ষে মহাযুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা খুব স্বাভাবিক। মহামতি ভীষ্মও তাঁর সঙ্গত প্রশ্নে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি সস্মিতবদনে উত্তর দিলেনঃ মহারাজ! পাণ্ডবদের পক্ষে সমবেত মহারথীদের মধ্যে অর্জুন বাসুদেব ব্যতীত কেউই আমার সমকক্ষ যোদ্ধা নয়। বাসুদেব এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না আর অর্জুনকেও আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করি না। তোমাদের মতন পাণ্ডবেরাও আমার পরম স্নেহের পাত্র। আমি পাণ্ডবদের বা তাদের বংশধরদের হত্যা করে পূর্বপুরুষের

পিণ্ডলোপের কারণ হব না! কিন্তু সেজন্য যুদ্ধ করতে কখনও পরাঙমুখ হব না, যুদ্ধকালে একাধিকবার তার প্রমাণ তোমরা লক্ষ্য করবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে যতদিন আমি যুদ্ধ করব, প্রতিদিন দশ হাজার করে পাণ্ডবসৈন্য বধ করব এবং এক মাসে সমস্ত পাণ্ডব-বাহিনী ধ্বংস করব। কিন্তু রণস্থলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করলে কিংবা নারীরূপী দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী সামনে এলে আমি ধনুর্বাণ পরি-ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হব।

দুর্যোধন পিতামহের উত্তরে সন্তোষপ্রকাশ করে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। আচার্য দ্রোণ উত্তর দিলেন: মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আবার আগের মতন শক্তিও এখন আর নেই। আমার শিষ্য অর্জুন ছাড়া আমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পাণ্ডব মহারথীদের মধ্যে নেই। অর্জুন আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর শুনেছি, বনবাসকালে সে অনেক দিব্যাস্ত্র লাভ করেছে, যাদের প্রয়োগকৌশল আমার অজানা। আমিও মহারথী ভীষ্মের ন্যায় এক মাসে সমগ্র পাণ্ডববাহিনী যুদ্ধে ধ্বংস করতে পারি।

শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ কৃপাচার্যকে ঐ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: মহারাজ! দুমাসের আগে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ করা আমার সাধ্যের বাইরে!

আচার্য দ্রোণপুত্র মহাবীর অশ্বত্থামা ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীকভাবে বললেন: মহারাজ! আমি পারি দশদিনে।

সকলের উত্তরের মধ্যে যুক্তিশীল মানসিকতা ও স্বাভাবিক বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও অঙ্গরাজ কর্ণের উত্তর ছিল যেমন যুক্তি-হীন তেমনি অস্বাভাবিক। তিনি বললেন: মহারাজ! আমি পিতা-মহের ন্যায় স্থবির বা আচার্যের মত বৃদ্ধ নই। আবার অনাবশ্যক কালক্ষেপও করতে অনিচ্ছুক। আমি পাঁচদিন যুদ্ধ করে কুরুক্ষেত্রে সমাগত সমগ্র পাণ্ডববাহিনী বিনষ্ট করতে সক্ষম।

কর্ণের এই দম্ভোক্তির পরিণতি যে কি ঘটেছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডবশিবিরে গুপ্তচরেরা যখন এই সংবাদ বহন করে নিয়ে এল, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাইদের ও শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে সব কথা জানিয়ে বললেন:

পিতামহ ভীষ্মের কথার কখনও নড়চড় হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিদিন আমাদের দশ হাজার করে সৈন্য বধ করবেন। তিনি যদি রোজ রোজ আমাদের এত সৈন্য হত্যা করেন, তবে আমরা ক'দিন কুরুক্ষেত্রে টিকতে পারব ? তিনি ইচ্ছামৃত্যু বলেই আমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। বাসুদেব ! তুমিই আমাদের ভরসা। এখন আমরা কি করব, বল ?

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজের কথায় বিরক্ত হলেন। মাঝে মাঝে তাঁর বালকসুলভ প্রশ্নে তিনি ভীষণ বিব্রতবোধ করেন। অথচ তাঁর এই অকৃত্রিম সারল্য তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন আর এত ভালবাসেন বলেই তিনি কোনও রূঢ় কথা বলতে পারেন না। যুধিষ্ঠির পাণ্ডব পক্ষের প্রধান, তাঁরই ন্যায্য রাজাধিকার বজায় রাখতেই এই যুদ্ধের অবতারণা। তাঁরই সমর্থনে জীবনপণ করে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন দেশের অগণিত রথী-মহারথী সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু যিনি এই মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় পুরুষ, যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর এই দোলাচল মানসিকতা খুব ক্ষতিকারক। সবার কাছে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেলে সৈন্যদের মনোবল যে একেবারে ভেঙে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই বাসুদেব মৃদুকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ঃ ধর্মরাজ ! অকারণ চিন্তিত হচ্ছেন। আপনার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাজ্ঞব্যক্তির পক্ষে এ-জাতীয় উক্তি অশোভন। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শত্রু তো সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যক্ষয়ের চেষ্টা করবেই আর শত্রুর পক্ষে সেটাই সঙ্গত। সেজন্য অহেতুক চিন্তা করে বিচলিত হলে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, নিজেদের মনোবল পর্যন্ত বিনষ্ট হবে। প্রাণী মাত্রেই মরণশীল, প্রত্যেক প্রাণীরই একদিন-না-একদিন মৃত্যু অনিবার্য। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছেন বটে, কিন্তু অমর নন। তিনি প্রতিদিন প্রতিজ্ঞা রাখতে দশ হাজার সৈন্যহত্যা করলেও চিরকাল তা করতে পারবেন না। আজও তাঁর মনে মৃত্যুবাসনা জাগে নি বলে যে কোনদিন তা দেখা দেবে না এ কথা কি জোর করে বলা যায় ? আমরাও তো যুদ্ধে চুপ করে বসে থাকব না ! আমাদের সপক্ষেও মহারথীদের অভাব নেই ! একা অর্জুন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য তিনজনের চেয়ে বেশি শক্তিধর। আপনি অমূলক ভাবনা পরিহার করে

আগামী যুদ্ধে কৌরবদের পর্যুদস্ত করতে তৎপর হোন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হলেন। আকস্মিকভাবে যে চিন্তা তাঁর অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, তা বিদূরিত হল। তিনি সুগভীর প্রশান্তিতে বললেন: জনার্দন্! তুমি চিরকালই হিতপরামর্শ দিয়েছ, আজও তোমার কথা আমার চিন্তা দূর করল। তোমার প্রিয়সখা অর্জুনের বীর্যবত্তা আমার অজানা নয়। আমি আসন্ন মহাসমরে তার উপরেই বেশি নির্ভর করি।—এই বলে তিনি হঠাৎ অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন: অর্জুন! তুমি তো সবই শুনলে। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্যশ্যালক কৃপাচার্য আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা ও মহাবীর কর্ণের উক্তি সম্বন্ধে তোমার মত কি! তুমি কতদিনে সমস্ত কৌরববাহিনী বিনষ্ট করতে পার!

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অকস্মাৎ এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রশ্ন শুনে প্রথমে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন: মহারাজ! পিতামহ, আচার্য, আচার্যশ্যালক বা আচার্যপুত্র নিজেদের সামর্থ অনুসারে সঙ্গত কথা বলেছেন কিন্তু কর্ণ ঠিক কথা বলেন নি। অত্যধিক আত্মম্ভরিতার জন্য তিনি অকারণ দম্ভ করেছেন।—দাদা! আপনার আদেশ পেলে আর যদুপতি বাসুদেব ইচ্ছা করলে আমি একদিনের মধ্যেই সমগ্র কৌরববাহিনী বিনাশে সমর্থ, আবার একদিনই বা বলছি কেন, চোখের পলকে মুহূর্ত মধ্যে সকলকে ধ্বংস করতে পারি।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের উক্তিতে বিস্মিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকালেন। তিনি তাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন: ধর্মরাজ! তৃতীয় পাণ্ডব সব্যসাচী বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করে নি। সে আপনাকে সত্যি কথা বলেছে।

## ॥ তেরো ॥

কৌরব রাজসভা থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের আঠের দিন পরে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর প্রত্যুষে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে

কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের অসম মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটল। প্রাচুর্য ও সমারোহের দিক থেকে বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে কোনপ্রকার তুলনাই চলতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুরোধা দুর্যোধন এক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন রাজতন্ত্রের কর্ণধার। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতুল ঐশ্বর্য ও অপর্যাপ্ত সম্পদ তো ছিলই, তদুপরি তিনি কপট অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবদের ক্ষমতাচ্যুত ও রাজ্যচ্যুত করে ইন্দ্রপ্রস্থের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন! অধিকন্তু তাঁর মিত্রশক্তির অন্তর্গত রাজন্যবর্গ ও আশ্রিত রাজাদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠির ছিলেন রাজ্যহারা পরাশ্রিত কপর্দকশূন্য নৃপতি, ব্যক্তিগত সঙ্গতি বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। আত্মীয় বন্ধু ও অনুরাগী রাজাদের, বিশেষ করে পাঞ্চালনৃপতি মহারাজা দ্রুপদ ও মৎস্যাধিপতি মহারাজা বিরাটের সার্বিক সাহায্য এবং যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতাই ছিল তাঁর অন্যতম ভরসা। তাই মহাসমরের প্রাক্কালে দেখা গেল যে একদিকে কৌরবদের সুশিক্ষিত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের বিশাল বাহিনী, মহাবল মহারথীদের ছড়াছড়ি, বিপুল সমরোপকরণ, অপর্যাপ্ত অশ্ব হস্তি রথ ভোজ্যদ্রব্য ইন্ধন প্রভৃতি—সর্বত্রই কোনও আয়োজনের বিন্দুমাত্র অভাব নেই ; অন্যদিকে পাণ্ডবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য —সংখ্যার দিক থেকে একে তো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম তার উপর আবার এদের অনেকেই যথাযথভাবে যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অস্ত্রশস্ত্র গজ রথ ভোজ্যদ্রব্য ইন্ধন প্রভৃতিরও কিছুমাত্র প্রাচুর্য ছিল না। সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্বেও পাণ্ডবদের অনমনীয় মনোবল, অপরিসীম বীর্যবত্তা ও অবিচল ধর্মনিষ্ঠাই কৌরবদের অন্যায় চক্রান্তের প্রতিকারকল্পে পারস্পরিক মুখোমুখি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রথম যেদিন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেদিন কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, কি সমারোহ! প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান, দেবার্চনা ও হোমাদি-সমাপন করে উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। কুরুক্ষেত্রের পূর্বপ্রান্ত থেকে পাণ্ডববাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমদিকে কৌরববাহিনীর অভিমুখে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। প্রধান সেনাপতি

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম দলের, সর্বসেনাপতি অর্জুন, সেনাপতি সাত্যকি ও মহাশক্তিধর ভীমসেন দ্বিতীয় দলের এবং সেনাপতি দ্রুপদ ও সেনাপতি বিরাটের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তৃতীয় দলের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। কৌরববাহিনীও কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্বদিকে পাণ্ডব-বাহিনীর সম্মুখীন হল। প্রধান সেনাপতি ভীষ্মও বিশালবাহিনীকে সমুদ্রের ন্যায় ব্যূহাকারে সাজিয়ে তিনটি দলে বিভক্ত করলেন। তিনি প্রথম দলের নেতৃত্ব অর্পণ করলেন আচার্য দ্রোণের উপর, দ্বিতীয় দলকে নিজের অধীনে রাখলেন এবং তৃতীয় দলের পরিচালনার ভার দুর্যোধনের উপর ন্যস্ত করলেন।

মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে প্রত্যেক দিনই অচিন্ত্যনীয় ও অবিশ্বাস্য নানারকম ঘটনা ঘটতে লাগল। এগুলি একদিকে যেমন কল্পনাতীত, অন্যদিকে তেমনি নাটকীয়। যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বেই ঘটল এমন একটা ঘটনা, যা কেউ ক্ষণপূর্বে ভাবতেও পারেন নি। উভয়পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যখন পারস্পরিক সংঘর্ষে উদ্যত, কারো শাণিত তরবারি সূর্যকিরণে প্রতিভাত হচ্ছে, কারো বা ঊর্ধ্বে ধৃত বল্লম তোমর অঙ্কুশ প্রভৃতি শত্রুরক্তপানে লোলজিহ্বা প্রসারিত করছে, কেউ কেউ কার্মুকে জ্যা-রোপণ করে শরযোজনে উদ্যোগী হয়েছেন, আবার কেউ কেউ গদাহস্তে আস্ফালন করছেন, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে একাকী পদব্রজে কৌরববাহিনীর দিকে নিরস্ত্র অবস্থায় অগ্রসর হতে দেখে কেবল-মাত্র কৌরবেরাই নন, পাণ্ডবেরাও কম বিস্মিত হন নি। পাণ্ডবপক্ষের অনেকেই তাঁর হঠকারিতায় বিচলিত হলেন, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন আর অর্জুন তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু কোনদিক ভ্রূক্ষেপ না করে অবিচলিত চিত্তে একে একে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও শস্ত্রবিদ কৃপাচার্যের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। সকলের স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করে তিনি ফেরার পথে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানে ইচ্ছুক বীরদের সাগ্রহ আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের দাসীপুত্র যুযুৎসু সদল বলে কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

আকস্মিকভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে গেলে ভীষ্ম তাঁর শঙ্খে আওয়াজ করে মহাযুদ্ধের সূচনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে

কৌরবদের হাজার হাজার শঙ্খ শিঙা বেণু, দুন্দুভি প্রভৃতি বেজে উঠল। অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়' ভীমসেন 'পৌণ্ড্র', অর্জুন 'দেবদত্ত', নকুল 'সুঘোষ' ও সহদেব 'মণিপুষ্পক' মহাশঙ্খ বাজিয়ে মহাযুদ্ধকে স্বাগত জানালেন। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতির শঙ্খগুলিও একসঙ্গে বাজতে লাগল। উভয়পক্ষের শঙ্খ, শিঙা, বেণু, দুন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনিসমূহ এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের উন্মত্ত রণোল্লাস একত্রিত হয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্জনের ন্যায় প্রলয়ঙ্করর আওয়াজের সৃষ্টি করল।

যুদ্ধ আরম্ভের প্রায় শুরুতেই ঘটল আর একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। পাণ্ডবদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল যোদ্ধা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরই নন, অপরাজেয় মহারথী বলেও তাঁর খ্যাতির সীমা ছিল না। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অগ্রগণ্য বীরপুরুষ তিনি। যাদবপ্রধান মহারথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি। কপিধ্বজ রথারূঢ় গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী রণক্ষেত্রে অগণিত জ্ঞাতি ও আত্মীয়দের দেখে তাঁদের বধ করার কথা ভেবে হঠাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যুদ্ধবিরোধী মানসিকতায় অকস্মাৎ যেন তাঁর সমস্ত বীর্যবত্তা অন্তর্হিত হল এবং তিনি সচেষ্ট ও হতচেতন হয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানাভাবে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসম্বিত ফিরে পেলেন।

কুরুক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ করার প্রবণতা উভয় পক্ষকেই পেয়ে বসল। সূচনাতে কৌরবেরা সাগরসদৃশ বিশাল বাহিনীকে নিয়ে 'অক্ষোভ্যব্যূহ' রচনা করে যুদ্ধ শুরু করলে পাণ্ডবেরা 'অচল' ও 'বজ্র-ব্যূহ' নির্মাণকরে প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত হলেন। দ্বিতীয় দিনে কৌরবেরা ব্যূহ রচনা করলে পাণ্ডবেরা 'ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ' তৈরি করলেন, তৃতীয় দিনে কৌরবদের 'গরুড় ব্যূহের' প্রতিরোধে পাণ্ডবেরা সৃষ্টি করলেন 'অর্ধচন্দ্র ব্যূহের', পঞ্চম দিনে কৌরবদের 'মকর ব্যূহের' বিরোধিতায় পাণ্ডবেরা গড়ে তুললেন 'শ্যেন ব্যূহ', ষষ্ঠ দিনে কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ ব্যূহের' প্রতিবাদে পাণ্ডবেরা করলেন 'মকর ব্যূহ', সপ্তমদিনে কৌরবদের 'মণ্ডপ ব্যূহের' বিপরীতে পাণ্ডবেরা গড়লেন 'বজ্র ব্যূহ', অষ্টমদিনে কৌরবদের 'কূর্ম ব্যূহের' উপর আঘাত হানতে পাণ্ডবেরা রচনা করলেন

'শৃঙ্গাটক ব্যূহ', নবম দিনে কৌরবেরা 'সর্বতোভদ্র মহাব্যূহ' প্রস্তুত করে যুদ্ধের সূচনা ঘটালেন এবং দশমদিনে পাণ্ডবেরা মহারথী ভীষ্মকে বধ করার জন্য 'সর্বশত্রুজয়ী ব্যূহ' তৈরি করে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করতে তৎপর হলেন।

মহাযুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত রথী ও মহারথীদের পতন ঘটতে লাগল। প্রথম-দিনের যুদ্ধে মহারথী শল্যের নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে মহারাজা বিরাটের মধ্যম পুত্র উত্তর এবং সেনাপতি ভীষ্মের ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে কনিষ্ঠ পুত্র শ্বেত নিহত হয়। অভিমন্যুর তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথধ্বজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হল। উভয়পক্ষের অগণিত সৈন্য মৃত্যুবরণ করল! দ্বিতীয় দিনে কলিঙ্গরাজ শতায়ু ও তার দুই পুত্র সসৈন্যে ভীমসেনের হস্তে নিহত হলেন। অর্জুনের পরাক্রম কৌরবশিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করল। তৃতীয় দিনে কল্পনাতীত ঘটনার আকস্মিকতায় নাটকীয়তা তুঙ্গ স্পর্শ করে। ঘটনাটি যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অভূতপূর্ব। সেদিন মহারথী ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণে সারথি শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে তিনি কোনও অস্ত্র ধারণ করবেন না, নিরস্ত্র হয়ে অর্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করবেন। ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে কালান্তক যমের ন্যায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। প্রবল বারিধারা বর্ষণের মতন তাঁর অবিশ্রাম শরক্ষেপণে সমগ্র রনাঙ্গণে প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দিল, পাণ্ডববাহিনী ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠল, অগণিত সৈন্য সারথি অশ্ব-হস্তী মৃত্যুবরণ করল। অপরাজেয় ধনুর্ধর গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচীও তাঁর অপ্রতিহত গতিকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ তো হলেনই না, অধিকন্তু তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত অবিরত বাণের আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার বলেও অর্জুনের বীর্যবত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে সম্বিত ফিরিয়ে আনতে অপারগ হলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে তিনি বিখ্যাত সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে রথ থেকে ভূমিতে অবতরণ করলেন এবং মহারথী ভীষ্মের প্রতি প্রবল বেগে ধাবিত হলেন, পরে অবশ্য তিনি অর্জুনের কথায় অস্ত্রসংবরণ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিরস্ত্র কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যোগদানের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হল!

চতুর্থ দিনের সূচনাতেই সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর ভয়ঙ্কর গদার আঘাতে মহারাজা শল্যের পুত্রকে হত্যা করলেন। প্রবল শক্তিধর ভীমসেন প্রচণ্ড বেগে দুর্যোধনের দশহাজার গজবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে নির্বিচারে তাদের বধ করতে লাগলেন। তাঁকে বাধা দিতে এসে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের আটজন পুত্র সেনাপতি, জলসন্ধ, সুষেণ, উগ্র, ভীম, ভীমরথ, বীরবাহু ও সুলোচন মৃত্যুবরণ করলেন। পঞ্চম দিনে কুরু-বংশীয় সোমদত্তের পুত্র মহারথী ভূরিশ্রবার হাতে যাদববীর সাত্যকির মহাবল দশপুত্র পরলোকগমন করল। অর্জুনের সুতীক্ষ্ণ বাণের প্রহারে কৌরবপক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ভীষ্ম যথারীতি প্রত্যেক দিন দশ হাজার করে পাণ্ডবসৈন্য হত্যা করতে লাগলেন। ষষ্ঠ দিনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু, প্রতি-বিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন সসৈন্যে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধে সাহায্য করতে অগ্রসর হল এবং সকলে মিলে 'সূচী-মুখ ব্যূহ' রচনা করে কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে অপ্রতিহত গতিতে তাদের বধ করতে আরম্ভ করলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রদের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ, দুর্মুখ, জয়ৎসেন ও দুষ্কর্ণ ভূপাতিত হলেন। সপ্তম দিনের যুদ্ধের সূচনাতেই মহারাজা বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শাঙ্খ আচার্য দ্রোণের বাণাঘাতে নিহত হল। অর্জুনপুত্র ইরাবানের সঙ্গে যুদ্ধে অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ পর্যুদস্ত হলেন এবং ভাগিনেয় নকুল ও সহদেবের সঙ্গে সংগ্রামে মদ্রাধিশবর শল্য মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অষ্টম দিনে ভীমসেন আটজন ধার্তরাষ্ট্র সুনাভ, অপরাজিত, কুণ্ডধার, পণ্ডিত, বিশালাক্ষ, মহোদর, আদিত্যকেতু ও বহ্বাশীকে নিহত করলেন। এদিন অনার্য রাক্ষস অলম্বুষ মায়াযুদ্ধে ইরাবানকে বধ করলে ভীমসেনের পুত্র ঘটৎকচ ক্ষিপ্ত হয়ে কৌরব মহারথীদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে তুললেন। নবম দিনে ভীষ্ম ও অর্জুনের পরাক্রমে দু'পক্ষেরই অসংখ্য সৈন্য, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতি মৃত্যুবরণ করল এবং অগণিত রথাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের দশম দিনে ইন্দ্রপতন ঘটল। সমকালীন যুগে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ছিলেন কিংবদন্তী বীরপুরুষ। ইচ্ছামৃত্যু অপরাজেয় সেই মহারথীর যে কোনদিন পতন হতে পারে একথা ছিল একদিকে

যেমন অকল্পনীয়, অন্যদিকে ছিল তেমনি অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। অথচ এদিনের যুদ্ধে সেই অকল্পনীয় ঘটনা বাস্তবে রূপায়িত হল, অবিশ্বাস্য বিশ্বাস্য হয়ে উঠল, অসম্ভব সম্ভবে পরিণতি লাভ করল। যদিও দশদিন ধরে অসাধারণ যুদ্ধ করে ভীষ্ম অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য বধ করেছেন ও মহারথীদের শরাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন, তবুও উভয়পক্ষের অগণিত মৃত্যু বিশেষ করে ভীমসেনের হাতে ষোলজন ধার্তরাষ্ট্রের মৃত্যু এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। বংশরক্ষার যে মহান গুরুদায়িত্ব পিতা মহারাজা শান্তনুর কাছ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন এবং সুদীর্ঘ তিনপুরুষ ধরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে এসেছেন, কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধের ফলে আত্মকলহ ভবিষ্যৎ বংশলোপের আশঙ্কায় তাঁর আর বেঁচে থাকার শেষ বাসনাটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে মৃত্যুর বাসনা প্রকট হয়ে উঠেছিল। দশম দিনের যুদ্ধের শেষদিকে দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেই তিনি চিরদিনের জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুনের সুতীব্র শরাঘাতে তিনি বীরের বাঞ্ছিত শরশয্যা গ্রহণ করলেন। সে সময় সূর্য আকাশের দক্ষিণভাগে থাকায় তিনি দক্ষিণায়ন চলছে বুঝতে পারলেন এবং উত্তরায়ণে সূর্য আকাশের উত্তরদিকে না আসা পর্যন্ত তিনি শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মহারথী ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করলে মহারাজা দুর্যোধন অস্ত্রগুরু আচার্য দ্রোণকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য উপলক্ষ্যে হস্তিনাপুর যাত্রার প্রাক্কালে উপপ্লব্য নগরের পরামর্শ সভায় অভিমন্যু পাণ্ডব বংশধরদের হয়ে যে কথা দিয়েছিল কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তারা তার সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। পাণ্ডব বংশধরদের অপরিসীম বীরত্ব ইতিপূর্বেই কৌরবদের মধ্যে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, একাদশ দিনের যুদ্ধে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করল। মহারথী অভিমন্যুর বীর্যবত্তায় কৌশলরাজ বৃহদ্‌বল নিহত হলেন। সিন্ধুনৃপতি মহাবল জয়দ্রথ পরাজিত হলেন এবং মদ্রাধিপতি

মহারথী শল্যের সারথি মৃত্যুমুখে পতিত হল। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা শতানীক ও শ্রুতসেনও অসংখ্য কৌরব-সৈন্য, অশ্ব ও গজ বধ করল এবং অগণিত রথ ধ্বংস করল! পঞ্চ-পাণ্ডব ও পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় প্রভৃতি যোদ্ধারা বার বার কৌরব-সৈন্য ও রথীদের মর্দিত করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। কৌরবপক্ষের মর্মান্তিক বিপর্যয়ে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর পাঁচ ভাই সত্যরথ, সত্যবর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্মা : তিনি অযুত রথের সঙ্গে মালব ও তুণ্ডিকেরগণ ; অযুত রথের সঙ্গে মাবেল্লক ললিত্থ ও মদ্রকগণ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য যোদ্ধা সংসপ্তক ব্রত ধারণ করে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে আমরণ যুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

মহাযুদ্ধের দ্বাদশ দিনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা পরিচালিত সংসপ্তকেরা ও নারায়ণী সেনারা সম্মিলিত হয়ে মহারথী অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। জীবনপণ করে তুমুল যুদ্ধ করেও তাঁরা সুবিধা করতে পারলেন না। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ম শরাঘাতে ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক ও ত্রিগর্তদেশীয় সংসপ্তকেরা দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে লাগলেন। তৃতীয় পাণ্ডবকে অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখে আচার্য দ্রোণ 'গরুড় ব্যূহ' রচনা করে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। এই ব্যূহের মুখে স্বয়ং সেনাপতি দ্রোণাচার্য ; মস্তকে মহারাজা দুর্যোধন ও অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রেরা ; চক্ষুদ্বয়ে যাদববীর কৃতবর্মা ও শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য ; গ্রীবায় কলিঙ্গ, সিংহল ও প্রাচ্যদেশীয় বীরযোদ্ধারা ; দক্ষিণপার্শ্বে কুরুবংশীয় মহারথী ভূরিশ্রবা, মদ্রাধিপতি শল্য প্রভৃতি ; বামপার্শ্বে অবন্তীদেশের বিন্দ অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও মহাবীর অশ্বত্থামা, পৃষ্ঠদেশে মাগধ, অম্বষ্ঠ, পৌণ্ড্র, গান্ধার প্রভৃতি সৈন্যেরা ; বক্ষস্থলে সিন্ধুনৃপতি জয়দ্রথ, নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র প্রভৃতি ; পশ্চাদ্‌ভাগে পুত্র, জ্ঞাতি ও সবান্ধব অঙ্গরাজ কর্ণ এবং ব্যূহ মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি সুসজ্জিত এক পরাক্রান্ত মহাহস্তী পৃষ্ঠে অবস্থান করতে লাগলেন। কৌরবদের প্রতিরোধকল্পে পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র ব্যূহ' তৈরি করলেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পাণ্ডব পক্ষের কোনও মহারথী দ্রোণাচার্যের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারলেন না। সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথীরা তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে একে একে পরাজয়

বরণ করলেন এবং মহারাজা দ্রুপদের ভ্রাতা সত্যজিৎ নিহত হলেন। বিজয়ী কৌরববীরেরা পলায়মান পাণ্ডব সৈন্যদের নির্দ্বিধায় হত্যা করতে লাগলেন। মহারথী ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ পরলোকগমন করলেন। পাণ্ডববাহিনীকে বিপর্যস্ত হতে দেখে অর্জুন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে পরাজিত ও তাঁর ভাইদের হত্যা করে তাড়াতাড়ি ভগদত্তকে মহাশক্তিশালী বৈষ্ণবাস্ত্র ক্ষেপণ করলেন, কিন্তু সারথি শ্রীকৃষ্ণের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন অর্জুনের নারাচের প্রচণ্ড আঘাতে ভগদত্তের প্রবল পরাক্রান্ত মহাহস্তী নিহত হল এবং অর্ধচন্দ্র বাণে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে প্রাণহীন দেহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হল। তারপর যুগান্তকালে ধূমকেতু যেমন তার প্রচণ্ড দাবদাহে সর্বভূতকে দহন করে, তাঁর সুতীক্ষ্ম অস্ত্রসমূহের তেজে তেমনি কুরুসৈন্য দগ্ধ হতে লাগল। তিনি গান্ধার নৃপতির দুই ভাই বৃষক ও অচলকে একই তীরে হত্যা করলেন ও কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করলেন। অসংখ্য কৌরবসৈন্য তিনি প্রতিমুহূর্তে নিহত করতে লাগিলেন। কৌরবদের মধ্যে প্রবল হাহাকার উঠল। শক্তিধর ভীমসেন ও ধৃষ্টকেতুর খড়্গাঘাতে মহারাজ চন্দ্রবর্মা ও জ্যেষ্ঠ কেকয় নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র নিহত হলেন।

দেখতে দেখতে মহাযুদ্ধের দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হল। রাত্রি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতম হয়ে উঠল। অগ্রহায়ণ মাসের সুনীল আকাশে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একফালি বাঁকা চাঁদ অসংখ্য নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হয়ে বিরাজ করতে লাগল। জীবনমৃত্যুর আলো আঁধারিতে ঘেরা রক্তপিচ্ছিল সমগ্র কুরুক্ষেত্র প্রান্তর যেন তার স্বল্পালোকে বিরহবিদুর বিধবা নারীর মলিন বসনের ন্যায় প্রতিভাত হল। চারিদিকে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু, গলিত শবের ছড়াছড়ি, মুমূর্ষু প্রাণীর আর্তনাদ, শকুনি গৃধিনী পাখা ঝাঁপটানি, কুকুর শৃগালের কোলাহল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নরথ এবং শরাসন, গদা, অমর, অঙ্কুশ প্রভৃতি আয়ুধ। কৌরবশিবির শোকস্তব্ধ, বিষাদমলিন ও নিদ্রাহীন। দিনের পর দিন অগণিত সৈন্য রথী, মহারথী, অশ্ব, গজ প্রভৃতির মৃত্যুতে মহারাজা দুর্যোধন বিচলিত হয়ে উঠেছেন! শিবিরে পরামর্শ সভায় নিদারুণ ক্ষোভের সঙ্গে তিনি প্রধান সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে বললেনঃ আশ্চর্য! আপনি আমার প্রধান সেনাপতি। পাণ্ডবেরা প্রতিদিন আমাদের অসংখ্য সৈন্য, অশ্ব,

গজ প্রভৃতি বধ করছে ; অথচ আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েও তার কোনও ব্যবস্থা করছেন না। পাণ্ডবেরা বরাবরই আপনার প্রিয়। আপনার বিচারে আমরা বধের যোগ্য, তাই আপনি বার বার সুযোগ পেয়েও তাদের কোনও অনিষ্ট করছেন না। যুধিষ্ঠিরকে আয়ত্বের মধ্যে লাভ করেও তাকে বন্দী করলেন না, কেবল দিনের পর দিন আমাকে মিথ্যে আশায় আশ্বস্থ করে প্রতারিত করেছেন। প্রজ্ঞাবান সাধু ব্যক্তি কখনও অন্যের আশাভঙ্গ করেন না।

দুর্যোধনের কথায় দ্রোণাচার্য ভীষণ লজ্জিত হলেন। তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করতে বললেনঃ বৎস! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি সব সময়েই তোমার মঙ্গল কামনায় যথাসাধ্য যুদ্ধ করছি, কিন্তু আমার শক্তির তো একটা সীমা আছে। অর্জুন আমার অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য সন্দেহ নেই, তবু সে আমার চেয়ে অনেক বড় ধনুর্ধর। তুমি জেনে রেখো, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনে মণি-কাঞ্চনের অপূর্ব সংযোগ ঘটেছে। স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যে রথের সারথি এবং গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী যে পক্ষের মহারথী ; সে পক্ষকে পরাজিত করা কেবলমাত্র মানুষ কেন, দেবতারও অসাধ্য। তবু যদি তুমি একদিনের জন্যও যেকোনও উপায়ে যে কোনও মূল্যে পাণ্ডববাহিনী থেকে ওদের দু'জনকে পৃথক করে দূরে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে রাখতে পার, তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার শক্তির সম্যক পরিচয় তুমি লাভ করবে। এমন ভয়ঙ্কর ব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধ করব, যার আক্রমণ প্রতিহত করা কৃষ্ণার্জুন ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডব যোদ্ধাদের পক্ষে অসম্ভব।

তারপর অনেক রাত অবধি কৌরবশিবিরে বিভিন্ন মহারথীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল পরের দিন মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই সংসপ্তক বীরযোদ্ধাদের ও নারায়ণী সৈন্যদের সম্মিলিত বাহিনী অর্জুনকে যুদ্ধেরজন্য আহ্বান করবেন। অর্জুনও ক্ষাত্রধর্মের প্রথানুযায়ী সে আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবেন না, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য হবেন। কুরুক্ষেত্রের একপ্রান্তে পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সেনাপতি দ্রোণাচার্য দুর্ভেদ্য 'চক্র ব্যূহ' তৈরি করে সুপরিকল্পিত পাণ্ডববাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবেন।

## চোদ্দ

উপপ্লব্য নগর! আলো-আঁধারি ঘেরা কৃষ্ণাষ্টমীর রাত শেষ হয়ে এসেছে। শেষ প্রহরের চাঁদের দীপ্তিও অনেকখানি ম্লান। সমগ্র নগর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। অকস্মাৎ উত্তরা ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল ঃ বড় মা! মা! কোথায় আপনারা? শীগ্‌গীর বাঁচান—শীগ্‌গীর বাঁচান! ওঁরা সবাই মিলে আমার অভিকে মেরে ফেললে!

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শুরুর আগে থেকেই পট্টমহারাণী দ্রৌপদীর তত্ত্বাবধানে পাণ্ডব পুরমহিলারা উপপ্লব্য নগরেই বসবাস করতেন। যুদ্ধকালেও সে ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না, পুরমহিলাদের নিয়ে তিনি যথারীতি সেখানেই রয়ে গেলেন। তাঁর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলেও পঞ্চ পাণ্ডবের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে প্রতিদিন গুপ্তচর এসে যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ তাঁকে নিবেদন করত। অধিকাংশ সময়েই তাঁর সঙ্গে সুভদ্রা উপস্থিত থাকতেন, উত্তরাকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে দেখা যেত। সুখৈশ্বর্যে প্রতি-পালিতা উত্তরার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না, যুদ্ধের নৃশংস ঘটনাবলী বা বিভৎস লোমহর্ষক কার্যাবলী ছিল তার সম্পূর্ণ অজানা। রণস্থলের জীবন ও মৃত্যুর স্বল্প ব্যবধানকে সে উপলব্ধি করতে পারে নি কোনওদিন। তাই আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার-টাকেই সে নিছক খেলাচ্ছলে গ্রহণ করেছিল। সেজন্য যুদ্ধে প্রতিনিয়ত অগণিত মৃত্যু বিশেষ করে ভাইদের মৃত্যুও তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি। কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী শুনতে তার এতটুকু অনাগ্রহ ছিল না। গল্পের মতন ভাল লাগত সেগুলি। খুঁটিনাটি ঘটনা বিশেষতঃ প্রথম দিন থেকে অভিমন্যুর অসাধারণ বীর্যবত্তা ও অপরিসীম সাহসের কাহিনী শুনে তার অন্তর অপর্যাপ্ত আনন্দে ও আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠত। স্বামীর রণনৈপুণ্য ও বীরত্বের

খ্যাতিতে অপার্থিব গর্বে তার বুক অনেকখানি ফুলে উঠত। সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বীরজায়া অনুভব করে উৎফুল্ল হত এবং শত্রুর রক্তসিক্ত বিজয়ী স্বামীর বীরমূর্তি কল্পনা করে তার কল্পনাপ্রবণ ছোট্ট মন নানারকম স্বপ্নের জাল বুনত।

উত্তরার আকস্মিক চিৎকারে দ্রৌপদী ও সুভদ্রার ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা নিজেদের শয্যা পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ তার কাছে ছুটে এলেন। দ্রৌপদী উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি হয়েছে? কি হয়েছে উত্তরা? তুমি অমন করছ কেন?

উত্তরার ততক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। সে তখন পর্যাঙ্কের উপর উঠে বসে থর থর করে কাঁপছে। দ্রৌপদীর কোলে মাথা রেখে দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে বলে উঠলঃ বড় মা! একি দেখলাম! আমার মন কেমন করছে! এখন আমি কি করব?

দ্রৌপদী সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনার সুরে তিনি বললেনঃ কোনও ভয় নেই মা! আমি তো কাছেই রয়েছি। কি হয়েছে আমায় খুলে বল। আমি এখনি তার ব্যবস্থা করছি।

উত্তরা দ্বিধার সঙ্গে উত্তর দিলঃ বড় মা! আমি ঘুমের ঘোরে দেখলাম অভির খুব বিপদ। পিতা মাতুলকে নিয়ে সংসপ্তক ও নারায়ণী সেনার সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। পিতা ও মাতুলের অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝে আচার্য দ্রোণ কি একটা সাঘাতিক ব্যূহ রচনা করে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছেন। কৌরব রথীদের আক্রমণে দলে দলে পাণ্ডব সৈন্য নিহত হচ্ছে। পাণ্ডবদের বিপর্যয় দেখে একমাত্র অভি ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে, আর কোনও যোদ্ধা ব্যূহের অভ্যন্তরে যেতে পারেন নি। সে ব্যূহের মধ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। চারদিক থেকে ঘিরে সাতজন মহারথী তার দেহে অবিশ্রাম অস্ত্রাঘাত করছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। সে পিতা, মাতুল আর মধ্যম জেষ্ঠ্যতাতকে তারস্বরে চিৎকার করে আহ্বান করছে। কিন্তু কৌরব সৈন্যদের আনন্দোল্লাসে তার সে আকুল অর্তনাদ কারো কানে পৌঁছচ্ছেনা। ব্যূহে প্রবেশ করতে না পেরে মধ্যমতাত, মহাবীর সাত্যকি, মাতুল ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে অসহায়

বালকের মতন রোদন করছেন। কি হবে বড় মা? এখন কি হবে? অভি বাঁচবে তো?

দ্রৌপদী উত্তরাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন: উত্তরা তুমি অকারণ চিন্তা করে শুধু শুধু বিচলিত হচ্ছো। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনকে একটু স্থির কর। ভোরবেলাতেই আমরা তোমাকে নিয়ে যাত্রা করব। সেখানে অভিমন্যুর সঙ্গে তোমার দেখা হলেই তুমি বুঝতে পারবে যে অলিক স্বপ্ন দেখে তুমি মিথ্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই। তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। স্বপ্নকে বাস্তব মনে করলে তাতে অহেতুক রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়।

উত্তরা ছোট মেয়ের মতন ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল: অলিক স্বপ্ন! কিন্তু বড়ো দুঃস্বপ্ন বড় মা! তবে যে সবাই বলাবলি করছে, পিতা, মাতুল আর অভি ছাড়া কেউ 'চক্র ব্যূহ' ভেদ করতে পারবে না। 'চক্র ব্যূহ' কি বড় মা?

সুভদ্রা স্বগতোক্তির ন্যায় অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন: 'চক্র ব্যূহ'! সর্বনাশ!

দ্রৌপদীর কর্ণে সুভদ্রার অর্ধোচ্চারিত অস্ফুট ধ্বনি প্রবেশ করল। সুভদ্রা যে ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী, তা তিনি জানতেন। তাই তাঁর কথায় মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'চক্র ব্যূহ' কাকে বলে তুমি জান সুভদ্রা?

সুভদ্রা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন: 'চক্র ব্যূহ' হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কৌশলের একটা উল্লেখযোগ্য প্রণালী। শত্রুসৈন্যকে চক্রাকারে বেষ্টন করে এই ভীষণ ব্যূহ প্রস্তুত করা হয়। দুর্ভেদ্য এই ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে যাওয়া যেমন দুঃসাধ্য, শত্রুর কবল-মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসাও তেমনি কঠিন। কিন্তু দিদি! অভিমন্যু তো ব্যূহ থেকে নির্গত হবার কৌশল জানে না।

দ্রৌপদী বিস্মিত হয়ে বললেন: সে কি!

সুভদ্রা শান্ত কন্ঠে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ দিদি! বিবাহের পর স্বল্প অবস্থানকালে আমি তৃতীয় পাণ্ডবের কাছ থেকে চক্র ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশের কৌশল শিক্ষা করি. কিন্তু বহির্গমন পদ্ধতি শেখার

আগেই ইন্দ্রপ্রস্থে চলে আসায় আমার শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই অভিমন্যু বড় হলে আমি শুধু ব্যূহ ভেদের উপায়ই শেখাতে পেরেছি, নিজে না জানায় বেরিয়ে আসার পদ্ধতি শেখাতে পারি নি।

দ্রৌপদী চিন্তিত হলেন। উত্তরা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: তাহলে কি হবে মা? কৌরবেরা যদি চক্র ব্যূহ করে অভিকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে? ও বড় মা—

সুভদ্রা সস্নেহে উত্তরার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু কণ্ঠে বললেন: তুমি শান্ত হও মা! শত্রু তো বিপক্ষকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেই আর সেটাই তার প্রধান ধর্ম। কিন্তু তা বলে এভাবে ভেঙে পড়লে কি চলে! আর সে সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তাই বা বলি কি করে? যুদ্ধ শেষের পরে গুপ্তচর এসে সংবাদ দিয়েছে যে দাদাকে নিয়ে তৃতীয় পাণ্ডবের সংসপ্তক ও নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ একদিনে শেষ হয় নি, পরের দিনও চলবে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ তো কৌরবেরা নিতেই পারে। কিন্তু উত্তরা তুমি ক্ষত্রিয় রমণী, ক্ষত্ররাজ কন্যা ও ক্ষত্ররাজ বধূ। ক্ষত্রিয়ের ধর্মই যুদ্ধ আর যুদ্ধে স্বামীপুত্রকে উৎসাহিত করাই ক্ষত্রিয় রমণীর প্রধান কাজ। যুদ্ধে বিচলিত হওয়া তোমার শোভা পায় না। তুমি কখনও ভুলো না, অপরাজেয় ধনুর্ধর গাণ্ডীবধারীর তুমি পুত্রবধূ, মহারথী অভিমন্যু তোমার স্বামী—

উত্তরা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: বড় মা! দেখছেন,—মা কি সব বলছেন—

উত্তরার কথা শেষ হল না। দ্রৌপদী শুষ্ককণ্ঠে তাকে বললেন: তুমি অহেতুক উতলা হচ্ছো উত্তরা! আমরা তো প্রত্যুষেই যাচ্ছি। সেখানে গেলেই অভিমন্যুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে! আর দেবার মত কোনও উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকলে, ধর্মরাজ গুপ্তচর দিয়ে নিশ্চয় খবর দিতেন। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও! তুমিও প্রস্তুত থেকো সুভদ্রা। আমি প্রতিহারীদের যাত্রার ব্যবস্থা করতে বলছি।

দ্রৌপদী সেখানে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে সেনাপতি দ্রোণাচার্য তাঁর কথা রাখলেন। অর্জুন সংসপ্তক ও নারায়ণী সেনাদের সম্মিলিত যুদ্ধের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্তে চলে গেলে আচার্য দ্রোণ সুদক্ষ সেনানায়কের মতন বিশাল কৌরববাহিনী একত্রিত করে দুর্ভেদ্য 'চক্রব্যূহ' রচনা করে বিপুল বিক্রমে পাণ্ডববাহিনী আক্রমণ করলেন। ব্যূহের মধ্যে যাতে শত্রুসৈন্য কোনক্রমে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য সিন্ধুনৃপতি জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। কৌরব-বাহিনীর সামনের সারিতে রইলেন সেনাপতি দ্রোণাচার্য, মহারথী অশ্বত্থামা, মদ্রাধিপতি শল্য, গান্ধারনরেশ শকুনি, কুরুবংশীয় সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ও মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিশজন পুত্র : মধ্যভাগে থাকলেন মহারাজা দুর্যোধন, অঙ্গাধিপতি কর্ণ, শস্ত্রবিদ কৃপাচার্য ও রাজভ্রাতা দুঃশাসন এবং দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ ও অন্যান্য রাজপুত্রেরা দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের দিকে এগিয়ে চলল। কৌরব মহারথীরা ভালভাবেই জানতেন যে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত ধনুর্ধরেরই চক্রব্যূহ ভেদ করে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করার প্রয়োগ কৌশল ছিল অজানা। বাসুদেব যুদ্ধ করছেন না, তিনি নিরস্ত্র হয়ে অর্জুনের সারথি হয়েছেন। ধনঞ্জয়ও কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণপ্রান্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংসপ্তক বাহিনী আর নারায়ণী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাই অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে চক্র ব্যূহ ভেদ করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। পাণ্ডববাহিনীকে বিপর্যস্ত করার এই সুবর্ণ সুযোগ কৌরবেরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। তাদের এই সুপরি-কল্পিত আক্রমণ পাণ্ডবেরা প্রতিহত করতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তে শত শত পাণ্ডবসৈন্য মৃত্যুবরণ করতে লাগল ; মৃত্যুপথ-যাত্রী আহতদের আর্তনাদে রণভূমি মুখর হয়ে উঠল। প্রতিপক্ষদের মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে কেউ সৈন্যদের চাপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়ে, কেউবা মদমত্ত হস্তী বা অশ্ব পাদপৃষ্ঠে হয়ে আবার কেউবা রথচক্র পিষ্ট হয়ে হত বা আহত হল। ক্রমশ মৃতের স্তূপে রণক্ষেত্র ভরে উঠল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টকেতু দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি বড় বড় মহারথীরা বার বার চেষ্টা করেও ব্যূহ

ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অপারগ হলেন। পাণ্ডবশিবিরে সকলে হাহাকার করতে লাগলেন। 'গেল গেল' রব উঠল চারদিকে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা দেওয়াতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাৎক্ষণিক উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোচনা ও উপায় নির্ধারণে সেনাপতিদের ও মহাবল বীরযোদ্ধাদের শিবিরে ডেকে পাঠালেন। সকলে সমবেত হলে তিনি শুষ্কমুখে ম্লানকণ্ঠে বললেনঃ আমাদের আজ ঘোর দুর্দিন। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অর্জুন সংসপ্তকবাহিনী ও নারায়ণী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণপ্রান্তে চলে গেছে। সে স্বেচ্ছায় সেখানে যুদ্ধ করছে না. শত্রুর আহ্বানে ক্ষাত্র-ধর্ম রক্ষার জন্যই সে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে তাই তাকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনতে পারছি না। সে উপস্থিত থাকলে আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে আমাদের এভাবে বিপদে ফেলতে পারতেন না। বর্তমানে আমাদের মধ্যে এমন কোনও ধনুর্ধর নেই, যিনি চক্র ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করার নিয়ম জানেন। তাই বার বার আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে অগণিত সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে আজই সমস্ত সেনা বিনষ্ট হবে। আপনারা মহাপ্রাজ্ঞ বীরযোদ্ধা, সকলের বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপরেই আমার আস্থা রয়েছে। আপনারা আমাকে সুপরামর্শ দিন, এই প্রচণ্ড সঙ্কট থেকে উদ্ধারের উপায় বলুন. সমগ্র বাহিনীকে আশু ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ করুন।

যুধিষ্ঠির চুপ করতেই সমস্ত সভা জুড়ে বিষাদমলিন স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। সেই নিশ্চল স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রধান সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেনঃ মহারাজ! চক্র ব্যূহ ভেদ করা বোধ হয় সাধ্যাতীত। আমাদের একক বা সমবেত প্রচেষ্টায় ইতিপূর্বে কোনরকম ফলোদয় হয় নি। আমি এর থেকে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি নে।

মহাবল ভীমসেন মলিন বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ পাপিষ্ঠ চরিত্রহীন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান আমি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছি নে। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও ছিল শতগুণে শ্রেয়!

মহারাজা দ্রুপদ বললেন ঃ কৌরবেরা যেভাবে আমাদের সৈন্যদের হত্যা করছে, তাতে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে অসহায়ের মত অগণিত মৃত্যু আর চোখে দেখা যায় না।

মহারাজা বিরাট বললেন ঃ ধর্মরাজ! আপনি একাধিক মহারথীকে সংসপ্তক আর নারায়ণী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত করে মহাধনুর্ধর অর্জুন আর যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনুন! তাঁরা এলেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হবে। কেশবার্জুন ব্যতীত আজ আর বাঁচার পথ নেই।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নতমস্তকে পাংশুবদনে এতক্ষণ ধরে সকলের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনেছেন। আশু সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে তিনি নিজেও অনেক চিন্তা করেছেন, কিন্তু কোনও পথ তিনি খুঁজে পান নি। কিন্তু একবারও তাঁর মনে কৃষ্ণার্জুনকে যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা তো দূরের কথা, ধর্মবিরোধী বলে তাঁর কল্পনারও অগোচর ছিল। তাই মহারাজা বিরাটের আকস্মিক উক্তিতে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ মহারাজা বিরাট! আপনি একি অসম্ভব কথা বলছেন? ক্ষাত্র ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করতে আমি কেমন করে অর্জুন আর বাসুদেবকে আদেশ করব? তাদের বধ না করে তারা তো ফিরে আসতে পারবে না।

মহারথী সাত্যকি বললেন ঃ মহারাজ ঃ একবার যদি কেউ চক্রব্যূহ ভঙ্গ করতে পারতেন, একবার যদি ব্যূহদ্বার খোলা পেতাম, একবার যদি ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পারতাম; তাহলে কৌরবদের বিজয়োল্লাস মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি নিরুপায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

চেদিপতি ধৃষ্টকেতু বললেন ঃ ধর্মরাজ! আমাদের মধ্যে এমন কোনও মহারথী কি একজনও নেই, যিনি শুধু ব্যূহ ভেদ করে আমাদের প্রবেশের পথকে সুগম করে দিতে পারেন। মৃত্যুর বীভৎস তাণ্ডবলীলা ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

চেদিপতির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুত

কর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেনকে সঙ্গে করে অভিমন্যু সেখানে উপনীত হল। সে বিনীত ভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলল: জ্যেষ্ঠ তাতঃ আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে যে ভয়ংকর যুদ্ধ করছেন, সেকথা আমার অজ্ঞাত নয়। আপনি আমাদের নির্দেশ দেননি বলেই এতক্ষণ সবাই বাইরে ইতস্তত করেছি। কিন্তু অন্তরাল থেকে ভাইদের সঙ্গে আমি আপনাদের সমস্ত আলোচনা শুনেছি। আমাকে চক্রব্যূহ ভেদ করে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। অকারণ হত্যালীলা বন্ধ করে কৌরবদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্মাণের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করি।

যুধিষ্ঠির ও সভায় উপস্থিত মহাবীর যোদ্ধৃবর্গ অভিমন্যুর কথায় বিস্মিত হলেন। অভিমন্যু বীর, খ্যাতিমান ধনুর্ধর। বীরাঙ্গনা জননী সুভদ্রার তত্ত্বাবধানে ও মাতুল শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে সে এই অল্প বয়েসেই অসামান্য বীর্যবত্তার অধিকারী হয়ে উঠেছে। অপরাজেয় গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচীর অপরিসীম শৌর্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী সে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রথম দিন থেকেই সে তার বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে! কিন্তু সে যে চক্র ব্যূহের মতন ভয়ঙ্কর দুর্ভেদ্য ব্যূহও ছিন্নভিন্ন করতে পারে, সে কথা সকলের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। চিন্তাবহির্ভূত ঘটনার আকস্মিকতায় মানুষ যেমন হতচকিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবস্থাও সেই রকম হয়ে উঠল। বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে তিনি শুধু বললেন: সেকি! তুমি এই ভীষণ ব্যূহ ভেদ করতে পার? শিখেছ কার কাছে?

অভিমন্যু উত্তর দিল: পারি। মা আমাকে চক্র ব্যূহ ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রণালী শিখিয়েছেন। কিন্তু—

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু কি অভি!

অভিমন্যু ইতস্তত করে বলল: কিন্তু মা না জানায় ব্যূহ নির্গমন কৌশল তিনি আমায় শিক্ষা দিতে পারেন নি।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন: নির্গমন কৌশল না জেনেই তুমি ব্যূহ ভেদ করতে চাইছ! তোমার দুঃসাহস তো কম নয়!

অভিমন্যু বীরত্বব্যঞ্জক আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে উত্তর দিল: জ্যেষ্ঠতাত! আমার পিতা মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয়, মাতুল যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, জননী বীরাঙ্গনা সুভদ্রা আর জ্যেষ্ঠতাত মহাশক্তিধর ভীমসেন ও ধর্মের প্রতি-

মূর্তি স্বয়ং ধর্মরাজ আপনি। আমার সাহস যদি দুঃসাহস নয়তো কার হবে! জ্যেষ্ঠতাত! আর দেরি করবেন না! আমায় আদেশ দিন, আমি যুদ্ধযাত্রা করি।

যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিতচিত্তে ব্যাকুলভাবে বললেন ঃ না, না অভিমন্যু! চক্রব্যূহে যুদ্ধ বড় ভীষণ যুদ্ধ, যে ব্যূহের কাছে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কুন্তিভোজ, কেকয়রা ও সৃঞ্জয়গণ প্রভৃতি মহারথীরা ক্ষণমাত্র অবস্হান করতে পারছেন না, সেই ভয়ঙ্কর ব্যূহ ভেদ করে কেমন করে তোমায় কৌরববাহিনীর মধ্যে যেতে বলব! তার উপর তুমি তো নির্গমন কৌশলও জান না। না, না, প্রাণ থাকতে এ আদেশ তোমায় আমি করতে পারব না।

অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের কথায় বিচলিত হল, কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল ঃ যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণ ক্ষাত্রধর্মের অনুকূল নয়,তা বীরত্বের যথার্থ পরিচয়ও বহন করে না। আমি নির্গম কৌশল জানি না সত্যি, কিন্তু চক্র ব্যূহ ভেদ করে কৌরববাহিনী তো ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি। তখন পাণ্ডব মহারথীদের ব্যূহমধ্যে প্রবেশের কোনও বাধাই আর থাকবে না। যাদবপ্রধান সাত্যকি আর চেদিপতি ধৃষ্টকেতু তো সেই কথাই বললেন। কৌরবেরা পিতা আর মাতুলের অবর্তমানে পাণ্ডববাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চাইছেন, আর সেই উদ্দেশ্যেই কৌশলে সংসপ্তকবাহিনী ও নারায়ণী সেনাদের দিয়ে তাঁদের অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত করে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না, কৃষ্ণার্জুন অনুপস্হিত থাকলেও অর্জুনপুত্র মহাবীর অভিমন্যু উপস্হিত রয়েছে। তাঁদের এই জঘন্য চক্রান্তের উপযুক্ত উত্তর দিতে আপনি আমায় অনুমতি দিন।

সকলে একবাক্যে অভিমন্যুর কথা সমর্থন করলেন। সবার আগ্রহাতিশয্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁর মত পালটালেন। ভীমসেন, সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অভিমন্যুর দেহরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। ঠিক হল, তাঁরা তিনজন সর্বদা ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করবেন। খুব তাড়াতাড়ি সারথি সুমিত্র শক্তিশালী অশ্বচতুষ্টয় যোজিত রথ সুসজ্জিত করল। অভিমন্যু গুরুজনদের প্রণাম করে হাসিমুখে রথে আরোহণ করে দ্রুত রণক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত হল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনি করতে করতে অন্যান্য মহারথীরা নত উৎসাহে তার পিছন পিছন যাত্রা করলেন।

সিংহশাবক যেমন অকম্পিত হৃদয়ে গজযূতের প্রতি ধাবিত হয়, অভিমন্যুও তেমনি অবিচলিত চিত্তে কৌরববাহিনীকে প্রমত্ত বিক্রমে আক্রমণ করল। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি কোনও মহারথী তার সে প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না। সে নিমেষমধ্যে সকলের চোখের সামনে ব্যূহ ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং দলে দলে অগণিত কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগল। তার সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে মহারথী শল্য রথের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁ ভ্রাতা যুদ্ধ করতে এসে নিহত হলেন। দ্রোণাচার্য অভিমন্যুর অপূ বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে কৃপাচার্যের কাছে তার প্রশংসা করতে লাগলেন। শত্রুপুত্রের প্রশংসায় মহারাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তার প্ররোচনায় রাজভ্রাতা দুঃশাসন অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন।

দুঃশাসনকে কাছে আসতে দেখে অভিমন্যু উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কৌরব রাজসভায় লাঞ্ছিতা পট্টমহারানী দ্রৌপদীর ও পাণ্ডবদের অপমানের স্মৃতি কল্পনায় তার মানসপটে জাগরিত হল। সে শরে শরে তাঁকে জর্জরিত করে তুলল। ক্ষণকালের মধ্যেই দুঃশাসন রথের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, সারথি দ্রুত তাঁকে নিয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করল। দুঃশাসন মূর্ছিত হলে সদলবলে অঙ্গাধিপতি কর্ণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করতে এসে পরাজিত হলেন এবং তাঁর এক ভ্রাতা মৃত্যুবরণ করলেন।

অভিমন্যুর অসাধারণ রণনৈপুণ্যে ও অসামান্য বীরত্বে পাণ্ডব মহারথী বৃন্দ আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সিংহনাদ করতে করতে কৌরবসৈন্য আক্রমণ করলেন। সিন্ধুনৃপতি জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রক্ষা করেছিলেন। তিনি অভিমন্যুর ব্যূহমধ্যে প্রবেশে কোনও বাধা দিতে পারলেন না বটে, কিন্তু তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যূহদ্বার অবরুদ্ধ করে দিলেন। সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন,ভীমসেন,দ্রুপদ, বিরাট, শিখণ্ডী ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবল বীরযোদ্ধারা শত চেষ্টা করেও ব্যূহের অভ্যন্তরে যেতে

পারলেন না। জয়দ্রথের কাছে সকলেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে সকলে হাহাকার করে উঠলেন। ব্যূহের অভ্যন্তরে কুরুসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে মহাবীর অভিমন্যু একাকী নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে লাগল! শল্যপুত্র রুক্মরথ ও দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ নিহত হল।

প্রিয় ও একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে দুর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেত রথীদের একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করতে আদেশ করলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ বৃহদ্দল ও ভোজবংশীয় যাদববীর কৃতবর্মা একসঙ্গে তাকে ঘিরে যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু এত করেও কোনও ফলোদয় হল না। অভিমন্যুর হাতে বৃহদবল নিহত হলেন এবং অন্যান্য মহারথীরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ পরে পূর্বোক্ত মহারথীদের সঙ্গে হার্দিক্য মিলিত হয়ে আবার তাকে আক্রমণ করলেন। এবারেও তাঁরা পর্যুদস্ত হলেন। অভিমন্যু বারবার কৌরব মহারথীদের একক ও যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করে অগণিত কৌরববাহিনী বধ করতে লাগল। ক্রমশ মৃতের স্তূপে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল। শিবির মধ্যে প্রবল ত্রাস সঞ্চারিত হল। সকলে আতঙ্কিত হয়ে চরম মুহূর্ত গণনা করতে লাগলেন। মনে করলেন বুঝি বা আজকেই জীবনের শেষ দিন।

শেষে অনেক শলা-পরামর্শ করে সাতজন মহারথী একযোগে একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করে শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। এই সপ্তরথী হলেন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, দুঃশাসন ও শকুনি। একত্রে শরাঘাত করে কর্ণ অভিমন্যুর ধনুকের ছিলা কাটলেন, কৃপাচার্য সারথি সুমিত্রকে হত্যা করলেন ও কৃতবর্মা রথের অশ্বগুলি মারলেন। তারপর রথচ্যুত ষোড়শ বর্ষীয় যুবক অভিমন্যুকে সকলে নিষ্করুণভাবে প্রচণ্ড শরাঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। ধনুক নেই, সারথি নেই, রথের অশ্বগুলি মৃত্যুবরণ করেছে ; তাই নিরুপায় খড়্গ চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়ে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগল। দ্রোণাচার্য তার খড়্গ ভেঙে ফেললেন আর কর্ণ চর্ম ভেদ করলেন। সে তখন চক্র নিয়ে বিপক্ষের দিকে ধাবিত হল, শত্রুর শরাঘাতে তাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর সে গদা নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ

করতে আরম্ভ করল। তার সর্বাঙ্গ তখন শত্রুদের সুতীব্র বাণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অঝোরে রক্তক্ষরিত হচ্ছে, সেই দুর্বল হয়ে পড়েছে ; তবু তার যুদ্ধের বিরাম নেই। সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও সে ভীষণ গদাঘাতে সত্তরটি সঙ্গীসমেত কালীকেয়, সতেরজন রথী ও দশটি হস্তীকে হত্যা করল। তারপর সে দুঃশাসনের পুত্রের রথাশ্বগুলি বধ করে রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। তখন দুঃশাসনপুত্র তাকে আক্রমণ করলে দু'জনে গদাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ মস্তকে তার গদার প্রচণ্ড সহ্য করতে না পেরে অভিমন্যু অচেতন হয়ে ভূপাতিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করল। কাপুরুষের ন্যায় ক্ষাত্রধর্মবিরোধী অন্যায় যুদ্ধে ষোড়শ বর্ষীয় নিষ্পাপ মহাবীর অভিমন্যুকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে কৌরব মহারথীরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কৌরব বাহিনীর জয়ধ্বনিতে রণভূমি মুখর হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার আগেই এক অমূল্য মহাপ্রাণ মহাবীরের জীবনাবসান ঘটল। নৃশংস যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখে বুঝি বা কৃষ্ণানবমীর সূর্য লজ্জায়, ঘৃণায় ও দুঃখে অস্তমিত হল।